KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-70000

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীজর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫২/৫ ৫২/৬ ৫২/৭ ৫২/৮	Year of Publication : ভাদ্র ১৩৯৮ ॥ Sep 1991 আশ্বিন ১৩৯৮ ॥ Oct 1991 কার্তিক ১৩৯৮ ॥ Nov 1991 অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ ॥ Dec 1991
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৫ সেপটেমবর, ১৯৯১

নীহাররঞ্জন রায়ের দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই মনীষীর ব্যক্তিত্ব এবং কৃতির স্মৃতিচারণমূলক পর্যালোচনা করেছেন খ্যাতনামা সাহিত্য-সমালোচক, বঙ্গীয় রেনেশাঁসের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের অন্যতম পথিকৃৎ ড· অরবিন্দ পোদ্দার।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১১৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে "শ্রীকান্ত"-১ম পর্বের ৭৫তম প্রকাশবর্ষ স্মরণে তথ্যনিষ্ঠ প্রবীণ লেখক গোপালচন্দ্র রায়ের বিশেষ রচনা।

কথাসাহিত্যে গ্রেহম গ্রীনের অবদানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পর্যালোচনা।

কোটি-কোটি মানুষের জীবনে অমোঘ প্রভাব-বিস্তারকারী মৌসুমি বায়ুর আগমন এবং প্রত্যাগমন বিষয়ে সর্বাধুনিক তথ্যভিত্তিক প্রাঞ্জল প্রতিবেদন।

কাঙ্ক্ষিত রূপ অন্বেষায় চিত্রী এবং কবির প্রয়াস কি সমধর্মী? অনেকখানি এই প্রশ্নেরই উত্তর সন্ধানে বিশ্লেষণী নিবন্ধ, "নানা প্রেক্ষিতে চিত্রকলা/সম্ভাবনার সীমা ও সীমাবদ্ধতা"।

মানবমনে হিংসাভাব প্রশমনে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব।

গ্রন্থসমালোচনা, "ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি, কেইনস এবং কালেস্কি"।

*** *** ***

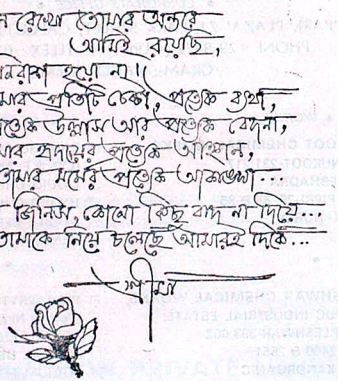

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ৫
সেপটেম্বর ১৯৯১
ভাদ্র ১৩৯৮

নীহাররঞ্জন রায় অরবিন্দ পোদ্দার ৩৫৩
শ্রীকান্ত : ৭৫তম প্রকাশবর্ষ গোপালচন্দ্র রায় ৩৬৪
গ্রেহম গ্রীন ও কথাশিল্প সুপ্রিয়া চৌধুরী ৩৮৭
মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমন উত্তরা বসু ৩৯৩

হোক শেষ দেখা বাসুদেব দেব ৩৫৯
সুধাবিন্দু কিরণশঙ্কর মৈত্র ৩৬০
একটি সকাল মীনাক্ষী রায় ৩৬১
ভাগলপুর দেবাশিস আইচ ৩৬৩

স্বপ্ন মীনাক্ষী ঘোষ ৩৭৯

গ্রন্থসমালোচনা ৪০০
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়,
অম্বর ঘোষ

চিত্রকলা ৪১৭
নানা প্রেক্ষিতে চিত্রকলা সমীর ঘোষ

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৪২৮
মানবমনে হিংসাভাব প্রশমনে বিজ্ঞান মহম্মদ ফজলে কাদের

মতামত ৪৩২
সুব্রমনিয়ন্ কৃষ্ণমূর্তি, দেবাশিস নাথ, যামিনীকান্ত সিংহ, বনানী চ্যাটার্জী,
অপূর্ব মিত্র, সুভাষচন্দ্র সরকার

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গর
সমৃদ্ধি কামনা করে

বনফুল জন্মোৎসব সমিতি

নীহাররঞ্জন রায় :
ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতি-সাধনা

অরবিন্দ পোদ্দার

১

সব আরম্ভের আগে যেমন আরম্ভ থাকে, তেমনি অতিশয় উদারমনোভাবাপন্ন, সংবেদনশীল সংস্কৃতিসাধক রূপে নীহাররঞ্জন রায়ের আত্মপ্রকাশের আগেও আরম্ভ ছিল ; যেমন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়েরও। জন্মসূত্রে আমি সিলেটি—অর্থাৎ শ্রীহট্ট জেলার লোক, কিন্তু আমার শৈশব কেটেছে ময়মনসিংহ শহরে, লেখাপড়া সেখানকার মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে। স্কুলে আমার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, নীহাররঞ্জনের পিতা, আর স্কুল পার হওয়ার পর বছর দুই পড়েছিলাম ময়মনসিংহেরই আনন্দমোহন কলেজে। সেখানে ইংরেজির অধ্যাপকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুধেন্দু রায়, নীহাররঞ্জনের দাদা। এই উভয় সূত্র থেকে নীহারদার সংস্কৃতি-কর্ম সম্পর্কে কিছু-কিছু সংবাদ আমরা ছাত্ররা পেতাম, যদিও কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমার ঘটে নি।

কৈশোরে তাঁর সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্যের আরও একটি কারণ ছিল। সেটা হল তাঁর আমাদের বৈপ্লবিক সংগঠন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সংযোগ। সেই যোগাযোগ খুব প্রবল না হলেও উপেক্ষণীয়ও ছিল না। আমরা যারা বালক বয়সে বৈপ্লবিক কর্মের দীক্ষা লাভ করি, তাদের নিকট একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ছিল খুবই আকর্ষণীয় বস্তু। আদর্শের একটা আত্মিক বন্ধন থাকে, যার সম্মোহে অপরিচিতকেও পরিচিত, দূরবস্থিতকেও নিকট আত্মীয় বলে বোধ হয়। নীহাররঞ্জন সম্পর্কে আমার মনোভাব ছিল সেইরকম।

তিনি ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়েছেন বলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মাস্টারমশাই অর্থাৎ তাঁর পিতা ব্রাহ্ম ছিলেন না। যদিও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ড. বিপিনবিহারী সেন—পুলিন সেনের পিতা—ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদের মধ্যে ছিলেন অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি এবং দেশসেবায় অনুপ্রাণিত, এবং যদিও ড. সেনের বাড়িতে মাস্টারমশায়ের ছিল নিত্য যাতায়াত, তবু সমাজের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল বলে মনে

নীহাররঞ্জন রায় (জন্ম ১৪. ১. ১৯০৩, মৃত্যু ৩০. ৮. ১৯৮১)-এর দশম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ রচনা।

হয় না। বরং স্থানীয় ব্রাহ্মদের সমালোচনায় তিনি ছিলেন উৎসাহী, প্রায়শই প্রগল্‌ভ হয়ে পড়তেন। তবে, নীহারদার জ্যেঠামশাই গগন হোম—অমল হোমের পিতা—ছিলেন দীক্ষিত ব্রাহ্ম, এবং তাঁর পরিবার বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবার রূপে ছিল সুবিদিত। বিশের দশকে নীহারদা যখন কলকাতার বিশাল সংস্কৃতি-জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করায় সচেষ্ট, তখন অমল হোম তাঁকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত করান। তাঁরই মাধ্যমে ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সান্নিধ্যলাভ। অমল হোমকে লেখা একটি চিঠিতে জানা যায়, নীহারদার বাক্‌চাতুর্যে শরৎচন্দ্র বিশেষ প্রীত হতেন।

মাস্টারমশাই উঁচু ক্লাশে বাঙলা পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে খুবই আনন্দিত করত। সেটা হল, ছাত্রদের মনকে পাঠ্য-পুস্তকের সীমায় আবদ্ধ না রেখে মুক্ত আকাশের অন্তহীনতায় মুক্তিদান করা। সেজন্য বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেমন তিনি অনায়াসে বিচরণ করতেন, তেমনি ছাত্রদের মধ্যে যাদের হৃদয়-সংবেদনা ছিল কিছুটা অধিক, তারা কল্পনার ডানা মেলবার অবকাশ পেত। তা ছাড়া, স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত, তেমনি ছিলেন মুক্ত মানসিকতার অধিকারী। ফলে, যে-কোনো বিষয় নিয়েই নির্বাধায় আলোচনা করতে পারতেন। পরিণত বার্ধক্যে মাঝে-মাঝে আমাকে চিঠি লিখতেন তিনি। সেই চিঠিগুলো সাহিত্যরসের আস্বাদন নিয়ে আসত, আর আমি বিস্মিত হতাম, তাঁর শব্দচয়নের নৈপুণ্যে এবং ভাষার চমৎকারিত্বে। আর, ওইসব মুহূর্তে আমার মনে হত নীহারদা সহৃদয় হৃদয়-সংবেদনার জন্য যে-খ্যাতি অর্জন করেছেন তা ওই পিতৃসূত্র থেকেই পাওয়া; এবং পিতৃসূত্র থেকেই এসেছে তাঁর গদ্য-রীতির অননুকরণীয় মাধুর্য ও সাবলীলতা।

২

জেলখানায় নীহারদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। আমার কারাবাস ময়মনসিংহ জেল ও দমদম সেনট্রাল জেলে। নীহারদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে কয়েক মাসের জন্য প্রেসিডেন্সি জেলে আটক ছিলেন। পারস্পরিক সাক্ষাতের কোনো অবকাশ ছিল না।

আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৯৪৬ সনের গোড়ার দিকে, কলকাতায় বন্দীদশা থেকে আমার মুক্তিলাভ করার কয়েক মাস বাদে। মাস্টারমশাই এবং অধ্যাপক সুধেন্দু রায়ের সৌজন্যে আমার নামটা তাঁর অজানা ছিল না, সেজন্য প্রথম দিনেই অনুভব করে-ছিলাম অন্তরঙ্গতার একটি দ্বার যেন অযাচিতভাবেই খুলে গেল। আমাদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয় যখন নীহাররঞ্জন রায় ও ত্রিদিব চৌধুরীর সম্পাদনায় আমরা "ক্রান্তি" সাহিত্যপত্র প্রকাশ করি, এবং এর দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশুনা করার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। পত্রিকার প্রয়োজনে আমাকে প্রায়শই নীহারদার বাড়ি যেতে হত। তখন খুব নিকটে থেকে, অন্য এক প্রেক্ষিতে থেকে, তাঁকে দেখার এবং জানার সুযোগ হয়েছে। সাহিত্য-সমালোচক নয়, ইতিহাস-বেত্তা নয়, শিল্পরসিক নয়, সামাজিক সমস্যাদির চিন্তায় উদ্বিগ্ন বুদ্ধিজীবীও নয়; তাঁকে জেনেছি মানুষ হিসেবে। একজন হৃদয়বান মানুষ অগণিত পরিচিত-অপরিচিত মানুষের কাছে নিজেকে কিভাবে গ্রহণ-যোগ্য করে রাখে তার পরিচয় পেয়েছি। দেখেছি, তাঁর পরিচয়ের পরিধি কত সুবিস্তৃত, এবং অপরিচিতের প্রতিও কত প্রসন্ন তাঁর সাদর সম্ভাষণ।

তাঁর বাড়ি থেকে কাউকে কখনও অপ্রসন্ন চিত্তে ফিরে যেতে আমি কখনও দেখি নি। কত বিচিত্র আবদার নিয়ে মানুষ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেত। গবেষণার কাজ, প্রবন্ধের জন্য অনুরোধ, কোনো সভায় সভাপতিত্ব, দলীয় তহবিলে চাঁদা, চাকুরির

উমেদারি, সার্টিফিকেট। যেসব বিষয়ে তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রেও প্রসন্নচিত্তে আশ্বাস দিচ্ছেন, যেন কারও অসন্তুষ্ট হবার কোনো কারণ না ঘটে। অর্থাৎ, তিনি সংবেদনায় মানুষকে কাছে টানতে পারতেন, এবং সাধ্যমত সকলকেই প্রতিষ্ঠার পথ ধরিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর সহানু-ভূতির সুযোগ নানা জনে নানানভাবে নিয়েছে। ব্যক্তি-গতভাবে দু-একজন সাহিত্যিককে জানি, যাঁরা তাঁকে কৌশলে প্রতারিতও করেছেন। একজনকে দেখতাম, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরে দেখা করতে যেতেন, অন্য একজন অসচ্ছলতার ভান করে বছরের পর বছর তাঁর কাছ থেকে প্রতি মাসে অর্থ-সাহায্য নিয়েছে, অথচ প্রকৃতই অসচ্ছলতার কোনো কারণই ছিল না। জানি না, তিনি এই অন্তরঙ্গ প্রতারণা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সচেতন হয়েছিলেন কিনা।

আমার সামান্য যেটুকু পরিচিতি, তার পেছনে নীহারদার অবদান সর্বাধিক। তাঁর নিঃস্বার্থ ঔদার্যের উদাহরণস্বরূপ পাঠকদের নিকট তা নিবেদন করি। তখন "ক্রান্তি"-র প্রকাশ চলছে; আমি সারাক্ষণের দলীয় কর্মী, ব্যক্তিগত আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় সাব-এডিটরি করি। ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের কোনো এক সকালে নৈশ শিফটের কাজ সেরে খবরের কাগজের অফিস থেকে সোজা নীহারদার বাড়ি যেতে হয়েছিল কী-একটা জরুরি প্রয়োজনে। গিয়ে দেখি, তিনি এক ভদ্রলোকের পাণ্ডুলিপি বিচারে ব্যস্ত। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, তথ্যসন্নিবেশ, যুক্তির সোপান, গদ্যের পরিশীলন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় আলোচনা করছেন এবং পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করে দেখিয়েও দিচ্ছেন ভাষার পরিমার্জনা ও পরিবেশনের উৎকর্ষ কিভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব। রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি এবং বিরক্তি নিয়ে আমি এক কোণে বসে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভদ্রলোক উঠলেন, এবং আমার ডাক পড়ল।

আমাদের প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা চলতে-চলতে হঠাৎ নীহারদা বলে উঠলেন, তুমিও কোনো একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা কর না কেন? আমি প্রতিবাদ করলাম—দলীয় কাজকর্ম, ক্রান্তি, খবরের কাগজের চাকুরি—এত সবের পর আমার অবসর কোথায়; গবেষণা তো অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার, আমার সাধ্যের অতীত। তিনি জেদ ধরলেন, আমি পারব। আমার বক্তব্য, আমি পারব না। মিনিট দশেক হবে, পারবে এবং পারব না—এই বাদ-প্রতিবাদে আমরা মুখর ছিলাম। একটু পরেই অনুভব করলাম, তাঁর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ জোর লাগল। বললেন, আমি বলছি তোমাকে করতেই হবে। আমার প্রতিবাদের বাঁধ ভেঙে গেল। বললাম, কথাটা যদি ওভাবে বলেন তো আপনার অবাধ্য হবার শক্তি কোথায় আমার। কী করতে হবে বলুন। তিনি পরদিন সকালে আবার যেতে বলেছিলেন আমাকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবেদনপত্র তিনিই সংগ্রহ করে এনেছিলেন, সেটা ভর্তিও করলেন তিনি, গবেষণার বিষয়বস্তুর জায়গায় নিজের হাতেই লিখলেন "বঙ্কিম মানস", অন্য একটি জায়গা নির্দেশ করে আমাকে দস্তখত করতে বললেন। ব্যস, আমার কাজ শেষ। ফর্মটা জমাও দিয়েছিলেন তিনি, আর বলেছিলেন, প্রয়োজনমত তাঁর শেলফ উজাড় করে পুঁথিপত্র আমি নিয়ে যেতে পারি। এরকম সুদুর্লভ সৌভাগ্যের মুহূর্ত কারও জীবনে কখনও এসেছে কিনা জানি না; তবে এটুকু জানি, তাঁর স্নেহপ্রীতির দাক্ষিণ্য এভাবে আমার উপর বর্ষিত না হলে "বঙ্কিম মানস" সম্ভবত কোনো দিনই রচিত হত না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, অনুরূপ না হলেও তাঁর স্নেহপ্রীতি-শুভেচ্ছার দাক্ষিণ্যে অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

৩

নীহাররঞ্জন রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভাবাবর্তে বিবর্ধিত হয়ে-

ছিলেন। সেই সংস্কৃতির একচ্ছত্র কালসীমা দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী-কালীন বঙ্গদেশ। রবীন্দ্রনাথ শুধু কলকাতার নয়, শুধু বঙ্গদেশেরও নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বোধিদ্যুতিময় সত্তা—সমগ্র পৃথিবীতে তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিচয়, বলতে গেলে ভারত এবং রবীন্দ্রনাথ ছিল সমার্থক। এমন একজন মানুষের সাহিত্যপাঠকের নিকট তিনি এক পরম বিস্ময়, গুরুদেব বলে তাঁর প্রতি যে সম্মাননা তা ওই মনোভঙ্গির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চলনেবলনে, সাংস্কৃতিক বোধে, হৃদয়-সংবেদনায়, কাব্যরীতিতে, পরিশীলিত গদ্যের ঝলকে, এমনকী হস্তাক্ষর অনুকরণের স্পৃহার মধ্যে রবীন্দ্র-আসক্তির স্বাক্ষর পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এই উপপ্লাবী প্রভাব নীহাররঞ্জনের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিজীবনে অনায়াসলক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পরিণত হয়েছিল কিনা জানি না; তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের অত্যন্ত একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন, অসংখ্য কবিতা ছিল কণ্ঠস্থ; এমনকী দীর্ঘ কবিতাগুলোও। এবং যে-কোনো প্রসঙ্গে তা আবৃত্তি করতে পারতেন। ওই দক্ষতা ছিল সত্যি অবাক করার মতো। সাহিত্য-ক্ষেত্রে নীহারদার রবীন্দ্র-আসক্তির প্রথম স্বাক্ষর "রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা"। সমালোচনা না বলে আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই আসক্তি-শব্দটি ব্যবহার করছি। কারণ, সে আমলের অধিকাংশ রচনার মতো এই গ্রন্থটিও ছিল অত্যধিক উচ্ছ্বাসপ্রবণ। ত্রিশের দশকের শেষ পাদে প্রকাশিত ওই গ্রন্থটি সাড়া জাগিয়েছিল সত্য, রবীন্দ্রকাব্যের পর্ব-বিভাগে এবং বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে কৃতিত্বও স্বীকার্য, কিন্তু এখানে সমালোচনার চেয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অধিক, নিস্পৃহ যুক্তি-নির্ভর অন্তর্দৃষ্টি অনুপস্থিত। তবে, তা একটি নতুন সংকেত বহন করছিল। তা হল, সাহিত্যকর্মকে একটি প্রবাহরূপে দেখা; জাতীয় আন্তর্জাতিক সমস্যা, রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তার মূল্যায়নের গৌরচন্দ্রিকা। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী লেখা অগ্রসর হয় নি। এ কথা তিনি নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তী কালে কোনো এক প্রসঙ্গে ওই বইটি পুনরুদ্রণের কথা উঠেছিল; তিনি আমাকে বলেছিলেন, আই হ্যাভ আউটগ্রোন দ্যাট বুক।

তিনি সত্যই আউটগ্রো করেছিলেন। পূর্ণ বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক, অন্য কথায় বিশুদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত গ্রহণ করতে না পারলেও তাঁর দৃষ্টিকোণ অনেকটা ব্যাপক হয়েছিল; সেখানে ভাবাবেগের কোনো স্থান ছিল না। ব্যক্তিগত ভালো লাগা-না-লাগার অর্বাচীনতা পরিত্যাগ করে তিনি শুদ্ধ বিষয়-গততার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন। সিমলার ইনডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভ্যান্সড স্টাডি-র প্রথম যে কয় বছর তিনি ডিরেকটর ছিলেন, তখন বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি বছরেই তিনি বেশ কয়েকটি সেমিনার বা আলোচনাসভার আয়োজন করতেন। কয়েকদিন ধরে চলত সেসব বৈঠক। বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ পেতেন। তাতে মত-বিনিময়ের যেমন অবকাশ থাকত, তেমনি ভিন্ন-ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে আলোচ্য বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও অনুপুঙ্খ বিচারেরও সুযোগ পাওয়া যেত। সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, ভাস্কর্য, ভাষাতত্ত্ব, আলোচ্যবস্তু যা-ই হোক না কেন, প্রেক্ষিতের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যে তা নতুন আলোক-সম্পাতে সমৃদ্ধতর রূপ নিয়ে প্রতিভাত হত। এই পদ্ধতির নামকরণ হয়েছিল মালটিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। এ পদ্ধতি নীহারদার খুব পছন্দ ছিল।

পরিণত বয়সে নিজের রচনাতেও তিনি অনুরূপ প্রেক্ষিত গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মৌর্য ও সুঙ্গ শিল্পকলার আলোচনায় তিনি প্রসঙ্গত লিখেছিলেন, আলোচ্য দুটি ঐতিহাসিক পর্ব সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য তিনি সংযোজন করছেন না, অথবা একান্তভাবে মৌলিক কোনো অভিমতও ব্যক্ত করছেন না। তাঁর লক্ষ্য হল, ওই কালের জীবনচর্যার পটভূমিতে উক্ত শিল্পকলার মূল্যায়ন, অর্থাৎ শিল্পকে জীবন-সমৃক্ত অভিব্যক্তি রূপে বিচার করা। অন্য কথায়, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত একটি বৈশিষ্ট্য রূপে এর মূল্য নিরূপণ। তিনি বলতেন, তাঁর পদ্ধতি নিছকই সমাজতাত্ত্বিক। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর বছরে কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা যা 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, "অ্যান অ্যাপ্রোচ টু ইনডিয়ান আর্ট" ইত্যাদি গ্রন্থে ওই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ প্রত্যক্ষ।

৪

কোনো একটি বিষয়ে একচ্ছত্র বিশেষজ্ঞের পাণ্ডিত্য সম্ভবত তাঁর ছিল না, কিন্তু অনুরাগ ছিল মানব-অভিব্যক্তির সমুদয় বিষয়েই। একথা তিনি নিজেই স্বীকার করতেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কলকাতায় একটি সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কোনো বিষয়েই তাঁর বিশেষজ্ঞের নিশ্ছিদ্র আধিপত্য নেই; তবে একথা ঠিক যে অসংখ্য বুদ্ধিমাগ্রীয় এবং কর্ষণীয় বিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ বিদ্যমান। এই অনুরাগ জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত তিনি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থাদির মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করলেই তা পরিস্ফুট হবে। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ, দরবারি মুঘল চিত্রকলা, রাজপুত চিত্রকলা, জাতীয়তাবাদ, শিখগুরু ও সমাজ, আইডিয়া অ্যানড ইমেজ ইন ইনডিয়ান আর্ট, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ, অ্যান অ্যাপ্রোচ টু ইনডিয়ান আর্ট ইত্যাদি। আর সবার উপরে আছে "বাঙ্গালীর ইতিহাস" (আদি পর্ব)। শেষোক্ত গ্রন্থটির জন্যই বাঙলার বিদ্বৎসমাজে তাঁর নাম সর্বদাই উচ্চারিত হয়।

সকলেই জানেন, "বাঙ্গালীর ইতিহাস" প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস নয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তা কখনও স্থান পাবে না। তথাপি, এ এক আশ্চর্য ঐশ্বর্যশীল ইতিহাস। স্থানে কালে বিধৃত থেকে মানস প্রকর্ষের মধ্য দিয়ে বাঙালি নামক এক জাতি বা জনগোষ্ঠী কিভাবে বিকশিত বিবর্ধিত হয়েছে, সম্পদ-সৃষ্টি এবং সামাজিক-রাষ্ট্রিক সম্পর্কের মধ্যে সেই সম্পদ কিভাবে সংহত হয়েছে, এবং সেই কাঠামোর ভিত্তিতে কিভাবে নির্মিত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক ইমারত—সেই প্রবহমান বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সংবেদনায়, ভালোবাসায়, আত্মিক সংহতির উদ্দীপনায়, ভাষার মাধুর্যে এ এক অসামান্য গ্রন্থ। পরিকল্পনা এবং উপস্থাপনায় সততই সক্রিয় রয়েছে সেই ইতিহাস-চৈতন্য, যা প্রবাহ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। আত্মবিকাশশীল একটি জনসমষ্টির অভিযানকে এর সমগ্রতায় গ্রন্থিত করা সহজ কাজ নয়। এই দুঃসাধ্য কাজটি নীহারদা অবলীলায় করেছেন।

কেতাবি ইতিহাসবিদগণ এই গ্রন্থটিকে উচ্চ মূল্য না দিলেও নতুন প্রেক্ষিত থেকে লেখা এই ইতিহাসকে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান বলে গ্রহণ করেছিলেন যদুনাথ সরকার। তাঁর উক্তি স্মরণ করে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটানো যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া, ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্যপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস বিষয়েই শুধু নয়, সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থ ইহার আগে কেহই লিখেন নাই।···বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি নীহাররঞ্জনের অটুট নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, অসংখ্য ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গীর সজীব বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, উচ্চস্তরের বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা এবং সর্বোপরি সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি এই গ্রন্থকে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের জগতে অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।'

সাহিত্য-সংস্কৃতির যাঁরা সাধক, যাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতি ভালবাসেন, তাঁদের নিকট মানবিক আদর্শের মূল্য অপরিসীম। বিশেষ করে যাঁরা সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের বেদনায় আর্ত। নীহারদা বাঙালির সংস্কৃতির অবিভাজ্যতার আদর্শে আজীবন বিশ্বাসী ছিলেন। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের একটি অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণে তিনি একদা বলেছিলেন, রাজনৈতিক চাতুরি দিয়ে কোনো বহমান সংস্কৃতিকে বিভক্ত করা যায় না; রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ভূগোলের সীমানা মানে, কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি কখনও তা মানে না। কারণ, জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহ তার উৎস, তার ধাত্রী। রাষ্ট্রসীমানা যদি সেই উৎস ছিন্ন করে দেয় তো সেটাকে দুর্ভাগ্য বলেই মানতে হয়।

কিন্তু, ভবিতব্য বলে মানতে হলেও বেদনা থেকেই যায়। দেশবিভাগ, সাংস্কৃতিক বিভাজন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নীহারদার সঙ্গে আমার অনেক দিন মত-বিনিময় হয়েছে। মনে পড়ে, একদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন, জীবনের শেষ দিনগুলো কলকাতায় কাটাব কে ভেবেছিল বল? আমি তো ভেবেছিলাম, জীবনের কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে যাব আমার শৈশবের লীলাক্ষেত্র ময়মনসিংহে, এবং আমাদের প্রিয় ব্রহ্মপুত্রের তীরেই দেহরক্ষা করব। কিন্তু ইতিহাসের বাধ্যবাধকতা মানুষকে ভিন্ন পথপরিক্রমায় বাধ্য করে।

কাল ও জীবনের জটিলতা এবং বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যেও নীহারদা মনের সজীবতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার দক্ষতা ছিল আশ্চর্য। কঠিন পরিশ্রম বা পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে না হোক, অন্যদের সঙ্গে আলোচনা বা বিতর্কের মাধ্যমে নতুন ভাবধারার সাযুজ্য তিনি লাভ করতেন, এবং নতুন চিন্তাকে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে নেওয়াতে তাঁর কখনও কোনো অসুবিধা হয় নি। তাঁর দেহের বয়স বেড়েছে সত্য, কিন্তু মনের বয়স বেড়েছে, একথা কেউই অনুভব করে নি কোনোদিন। তাঁর জীবনবোধ ছিল এমনি প্রখর, সমকালে সংস্থাপিত থাকার আগ্রহ এমনি ছিল অমলিন। অন্য অনেক অধ্যাপক বা বুদ্ধিজীবীর সম্পর্কে যে অভিযোগ অনায়াসে উচ্চারণ করা যেত তা নীহারদা সম্পর্কে উচ্চারণ করা যেত না। তাঁরা জীবনধারণ করতেন অতীতে; তিনি বেঁচে ছিলেন অতীতে নয়, বর্তমানে এবং শেষ মুহূর্তেও ফুরিয়ে যান নি।

অরবিন্দ পোদ্দারের জন্ম ৩রা নভেম্বর, ১৯২০, শ্রীহট্ট জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশ)। বলতে গেলে শৈশব থেকেই তিনি রাজনৈতিক ও প্রগতিবাদী সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। শ্রীপোদ্দার বর্তমানে অধ্যাপনা-পেশা থেকে অবসর নিয়েছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষক ও সমালোচক হিসাবেই তাঁর পরিচিতি সর্বাধিক। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল,—"বঙ্কিম মানস", "রবীন্দ্র মানস", "রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব", "রামমোহন / উত্তরপক্ষ", "মানবধর্ম ও বাঙলা কাব্যে মধ্যযুগ", "বঙ্কিম ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যের শত্রুরা", "Renaissance in Bengal—Quests and Confrontations", "Renaissance in Bengal - Search for Identity" ইত্যাদি।

হোক শেষ দেখা

বাসুদেব দেব

শরীরের দায় চুকিয়ে দিয়েই এসো
আগুনের পরে থাকে বুঝি শুধু ছাই
কি জানি এমন বিষম বয়সে এসে
অন্ধকারের আধখালি দেশলাই

সুরভিবাদী সে রোমানটিকেরা কবে
গুটিয়েছে তাঁবু, উত্তর আধুনিক
বাতাসে উড়ছে কাপাশের খ্যাপা বীজ
পালিয়েছে চোর, এইবার সাধু নিক
বুঝে তার বাড়ি, বড়ো পুরাতন ভাঙা
ঝড়ো হাওয়া আর সাপের সখ্য বেশ
শরীরের দায় চুকিয়েই তবে এসো

হোক শেষ দেখা, সব যুদ্ধের শেষ

সুধাবিন্দু

কিরণশঙ্কর মৈত্র

চারিদিকে সুধাবিন্দু থরোথরো
স্পর্শে ভয় পাই

এখনও উত্তাল ঢেউ
পাহাড়ে সূর্যের রেখা
অরণ্য ধূসর নয়—

ওষ্ঠে স্পন্দিত এই মধুর মঞ্জরী
মুষ্টি ভরে নিতে পারি নিঃশ্বাসবায়ু
প্রতিমার পায়ে ঝরে সমুদ্রের ফুল

সূর্য ডোবার আগে মেখে নেব
সবুজ নির্যাস
সুধাবিন্দু রেখে দেব বুকের নিলয়ে,

অসময়ে আলো জ্বলে
ভয় কেন
অপ্রতিম প্রতিভা যদি অঞ্জলি-আশ্রয়।

একটি সকাল

মীনাক্ষী রায়

অনেক—অনেক রাত পার হয়ে এসে
পেয়েছি একটি সকাল—
একান্ত আমার। উথাল পাথাল
কত কুণ্ঠিত দিনের পারাবার
দিয়েছি যে পাড়ি—লইতে হিসাব তার
মন নাহি চাহে। মূর্খ উচ্ছ্বাসের
অক্ষম তরীখানি—নির্বাসিত বালুচরে
এসেছি যে ফেলে। অনাবিল মুহূর্তের তরে
প্রতীক্ষা আগন্তুক মনের। উদাসী ক্ষণের
মৌন অবসান। অপ্রগল্‌ভ উল্লাসের
আরক্তিম উষ্ণ সাড়া—দিয়ে যায় পাড়ি—
দিগন্তের রক্তসাগর আবেশে সন্তরি।
রবাহূত অনাহূত পুরানো যে দিন
অতিথি সূর্যেরে জানায় অমলিন
সৌম্য আমন্ত্রণ।—তারপর চলে যায়
আতুর উদাসী বনভূমিছায়—
কুয়াসা হাউই হয়ে কোথায় মিলায়
তারা—অতীতের কোন্ হিম মাসে,
হেমন্তের নিমন্ত্রণহীন সকরুণ ঘাসে।
অন্ধকার স্তব্ধ গাঢ় সৈকত
পার হয়ে—স্থূল শতাব্দীর বিগত
আর্তিকে নির্বাসন দিয়ে,
আনন্দ রহস্যঘন সম্ভার নিয়ে
সোনালি সূর্যের স্বচ্ছ প্রকাশ—
অনাদির নীল দিগন্তে। অব্যক্ত বিকাশ
পূর্ব তোরণে-তোরণে। শিশিরের লাবণ্য সাগরে
তুলেছে যে ঢেউ—একটি সকাল। আমারি তরে—
শুধু আমারি হৃদয়ের শঙ্খমিনারে—
ধানের সবুজ গুচ্ছের কিনারে-কিনারে,
স্বচ্ছন্দ পরিতৃপ্ত আকাশের মতো—
সুনিশ্চিত—স্বাগত—দিগন্তবিস্তৃত।
আনন্দ উল্লাস প্লাবন বয়ে-বয়ে যায়,
ডাক দিয়ে মেঘে-মেঘে কোথায় মিলায়।
নরম নদীর জলের গন্ধটুকু মেখে—

আপন বুকের ঢেউয়ে কান পেতে রেখে
আমাকে শোনাতে চায় আগামী বারতা,
আমারি একটি সকাল—অস্ফুট সে কত কথা,
অনির্বচনীয়, অব্যক্ত, তবু একান্ত আমার—
উত্তরণ আলোর নীড়ে—পেরিয়ে আঁধার।

ভাগলপুর

দেবাশিস আইচ

এই খণ্ডহর, সত্য।
এই পোড়া গাঁ-গ্রামান্তর
দোকান-পাট, মসজিদ-মাজার।

এই বিষবাষ্প
বিষাদ উপত্যকা
বিভেদের চওড়া কালো দেওয়াল, সত্য সবই

এই ঘৃণার আগুন, সত্য।
বিশ্বাস বিচূর্ণ পথের ধুলোয়
পোড়া ছাই, পুড়ে থাক মানবজনম।

এই হিংস্র নখ, দাঁত,
কাটা মুণ্ড হাতে বুনো উল্লাস,
কুয়া, জলা ভরে থাকা লাশ—সত্য তাও।

এই তানাহ, জালিম সত্য।
গায়েবি জানাজার মোনাজাত
কাতর আর্তিতে ভরে বিখণ্ড আকাশ।

তথাপি, সত্য আছে আরো—চিত্র বিপরীত।

এই কলুষ লেহর
বানভাসি লোঙ্গাই, চান্দেরি আরো শতেক গ্রাম
তথাচ, ভগ্ন আলে পেতেছিল বুক শাশ্বত আরুণি।

এই তমস্বিনী রাত্রি
রৌদ্র-লুপ্ত তমস নগরী
তবুও তো দীপান্বিতা জ্বেলেছে প্রদীপ ঘরে-ঘরে।

এই উন্মত্ত চিতার উৎসবে
হিমসন্ত্রাসে একদা উষ্ণ জনপদ, কাঁপে;
আর মা, অনন্ত আঁচল পেতে দিয়েছে তাপ।

ফুয়াদ প্রতিভা গিরিজা শবনম…
মানুষের নাম, নাম মানুষীর।

শ্রীকান্ত—১ম পর্ব : ৭৫তম প্রকাশবর্ষ

গোপালচন্দ্র রায়

আজ থেকে ঠিক ৭৫ বছর আগে ১৩২৩ সালের মাঘ মাসে শরৎচন্দ্রের সুবিখ্যাত "শ্রীকান্ত—১ম পর্ব" বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই হিসাবে এই বইটির এখন প্ল্যাটিনাম উৎসব বলা যেতে পারে। এই বই প্রথম প্রকাশ করেন কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যানড সন্স।

শ্রীকান্ত—১ম পর্ব বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৩২২ সালের মাঘ থেকে ১৩২৩ সালের মাঘ —এই ১৩ মাস "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী" নামে "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। "ভারতবর্ষ" পত্রিকারও মালিক ছিলেন ওই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যানড সন্স।

"ভারতবর্ষে" প্রথম দু মাস "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী"র সঙ্গে লেখক হিসাবে নাম ছিল—শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা। এর পর তৃতীয় মাস থেকে নাম থাকে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র এই "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী"কে বই করার সময় "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত লেখায় কিছু-কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছিলেন।

১৩২৩ সালের মাঘ থেকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর (মৃত্যুর তারিখ ২রা মাঘ ১৩৪৪) পরও অনেক বছর পর্যন্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যানড সন্সই ছিলেন এই বইয়ের প্রকাশক আর বিক্রেতা। মাঝে কেবল শরৎচন্দ্রের জীবিত-কালে কলকাতার "বসুমতী সাহিত্যমন্দির" সাত খণ্ডে "শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী" বার করার সময় ১ম খণ্ডে এই "শ্রীকান্ত ১ম পর্ব" দেন। বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের "শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী"র ১ম খণ্ড বেরিয়েছিল ২০. ১০. ১৯১৯ তারিখে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বছর পর থেকে কলকাতার এম. সি. সরকার অ্যানড সন্স "শরৎসাহিত্য সংগ্রহ" নাম দিয়ে ১৩ খণ্ডে শরৎসাহিত্য প্রকাশ করে আসছেন। এঁদের "শরৎসাহিত্য সংগ্রহে"র ১ম খণ্ডে আছে "শ্রীকান্ত ১ম পর্ব"। ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানিও শরৎচন্দ্রের বহু বই পৃথক-পৃথক ভাবে ছাপার সময় এই "শ্রীকান্ত—১ম পর্ব"ও ছাপেন; এঁরা আবার চার পর্ব শ্রীকান্ত একত্রে ছেপেও বিক্রি করেন।

শরৎচন্দ্রের বইয়ের কপিরাইট বা স্বত্ব চলে যায় ৩১. ১২. ৮৮ তারিখে। আন্তর্জাতিক নিয়মে অনুসারে লেখকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে তাঁর বইয়ের স্বত্ব তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাত থেকে সাধারণের হাতে চলে যায়। তখন যে-কেউ তাঁর বই ছাপতে পারেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতারিখ ১৩৯৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি। বছরের প্রথম মাস মৃত্যু-তারিখ হলেও ওই আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারেই ১৯৮৮ সালটা পুরোই বইয়ের স্বত্ব শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের হাতে ছিল।

শরৎচন্দ্রের বইয়ের কপিরাইট চলে যাওয়ার কিছুদিন আগে কলকাতায় "শরৎ সমিতি" এবং "আনন্দ পাবলিশার্স" শরৎসাহিত্য প্রকাশ করেন। শরৎ সমিতির বইয়ের নাম "শরৎ-রচনাবলী", আর আনন্দ পাবলিশার্সের বইয়ের নাম "শরৎসাহিত্য সমগ্র"। পরে "শরৎ সমিতি" আর "শরৎ-রচনাবলী" প্রকাশ না করলেও "আনন্দ পাবলিশার্স" আজও তাঁদের ওই বই প্রকাশ করে আসছেন। আর কপিরাইট চলে যাওয়ায় এখন তো অনেকেই শরৎচন্দ্রের বই ছাপছেন।

"শরৎ সমিতি" শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের সময় একটা নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে বই ছেপে বিক্রি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে ৫ খণ্ডের এক লক্ষ সেট "শরৎ-রচনাবলী" ছেপে বিক্রি করেছিলেন। এঁরা সেই সময় শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে চুক্তি করে আরো বই ছাপার ব্যবস্থা করতে পারলে মনে হয় তখনই আরো কয়েক লক্ষ সেট বই বিক্রি করতে পারতেন।

সেই গুরুদাস থেকে শুরু করে এখন শরৎসাহিত্যের কপিরাইট চলে যাওয়ায় এ পর্যন্ত সকল প্রকাশক মিলে "শ্রীকান্ত ১ম পর্ব" বইটি বোধ করি দশ লক্ষেরও অধিক কপি বিক্রয় করেছেন।

ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে এই বইটিরও অনুবাদ হয়েছে। আর ইংরাজি, ফরাসি, ইতালীয় এবং রুশ ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। "শ্রীকান্ত ১ম পর্বে"র ইতালীয় অনুবাদ পড়ে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলেছিলেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীযুক্ত অবন্তীকুমার সান্যাল তাঁর "ভারতবর্ষ" বইয়ে (রোলাঁর ফরাসি ভাষায় লেখা *Inde* বইয়ের বাঙলা অনুবাদ) লিখেছেন রোলাঁ গুরনিজেলের সঙ্গে শ্রীকান্তের ইতালীয় অনুবাদ পড়েছিলেন। এটা ভুল। গুরনিজেল সুইজারল্যানডের একটি জায়গার নাম, কোনো ব্যক্তির নাম নয়। পঁচাত্তর বছর ধরে এই বাঙলা বইটির এত বেশি প্রচার এবং সম্মান দেখে বাঙালিমাত্রেই গর্ব বা আনন্দ বোধ করতে পারেন। কিন্তু এই পঁচাত্তর বছর ধরেই অর্থাৎ বইটি প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই প্রকাশকের ভুলে, এমনকী শরৎচন্দ্রের নিজেরও কিছু অনবধানতায় বইয়ে যেসব মুদ্রাকরপ্রমাদ, ছাড় ইত্যাদি ছোটো-বড়ো ভুল আজও চলে আসছে, সেজন্য বড়ো দুঃখও হয়। এখানে এই বইয়ের সেই, ভুলগুলো নিয়েই কিছু আলোচনা করছি।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যানড সন্স থেকে "শ্রীকান্ত—১ম পর্বে"র বহুবার পুনর্মুদ্রণ বা সংস্করণ হয়েছে। দেখা যায়, এইসব পুনর্মুদ্রণকালে কোনোবার বইয়ে কোথাও কোনো পঙক্তি বাদ পড়েছে, কোনো শব্দ বিকৃত হয়ে বসেছে। আবার কোথাও বা কোনো এক পুনর্মুদ্রণকালে সেই বইয়ের প্রুফ-সংশোধক নিজের ইচ্ছামতো এক-একটা শব্দও বসিয়েছেন। তাই গুরুদাসের এইসব পুনর্মুদ্রণের বইয়ে একবারের সঙ্গে অন্যবারের কিছু-কিছু পাঠভেদও হয়েছে।

গুরুদাসের এই ধরনের কোনো এক পুনর্মুদ্রণের বইকে আদর্শ করে এম. সি. সরকার অ্যানড সন্স

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : ১৫. ৯. ১৮৭৬, মৃত্যু : ১৬. ১. ১৯৩৮)-এর ১১৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ রচনা।

তাঁদের "শরৎ সাহিত্যসংগ্রহ" প্রকাশ করেন। ওইভাবেই ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানিও তাঁদের বই ছাপান। এঁদের পরস্পরের "শ্রীকান্ত—১ম পর্ব" বইয়ে একটু-আধটু ইতর-বিশেষ বা পাঠভেদ হয়েছে। আবার এম. সি. সরকারের বইয়ের সব পুনর্মুদ্রণও হুবহু এক নয়।

শরৎ সমিতির "শরৎ-রচনাবলী" সম্পাদনাকালে আমরা শরৎচন্দ্রের ওইসব গ্রন্থের সংশোধিত পাঠ-সহ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের বিভিন্ন মুদ্রণের বা সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে একটা সুষ্ঠু পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, মাসিকে প্রকাশিত রচনা যখন শরৎচন্দ্র কিছু-কিছু পরিবর্তন বা সংশোধন করে দিয়েই হোক বা হুবহু দিয়েই হোক প্রকাশককে বই করতে বলেছিলেন এবং পরেও কোনো-কোনো বইয়ের পাঠসংশোধন, এমনকী নতুন পাঠও সংযোজন করেছিলেন (শরৎ-সাহিত্যের পাঠোদ্ধার প্রবন্ধে এই নতুন সংযোজনের উদাহরণ দিয়েছি) তখন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখার পাঠ আর মেলাবার প্রয়োজন হবে না। এই ভেবেই তখন সময়ের স্বল্পতাহেতু পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখার সঙ্গে বইয়ের লেখা আর মেলাই নি। তবে একেবারে যে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখার সঙ্গে মেলানো হয় নি, তা নয়, অনেক সময় মেলানো হয়েছে। যেমন একটা বলি—

"শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে"র যতগুলো মুদ্রণ বা সংস্করণ ওই সময় দেখেছিলাম, সব কটাতেই বইয়ের শেষ দিকে এক জায়গায় লেখা ছিল—'আকাশের এক প্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ পূর্ণ শশী।' সব বইয়েই এই অর্থহীন লেখাটা পড়ে তখন "বিচিত্রা" মাসিক পত্রিকা দেখেছিলাম। এই "বিচিত্রা" পত্রিকাতেই "শ্রীকান্ত—৪র্থ পর্ব" প্রথম ছাপা হয়েছিল। সেখানে দেখি, শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—"আকাশের এক প্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শীর্ণ শশী।' 'শীর্ণ শশী' 'পূর্ণ শশী' হয়ে ছাপা হচ্ছিল।

শরৎ সমিতি শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে চুক্তি করে প্রথমে পাঁচ খণ্ডে ৫০ হাজার সেট "শরৎ-রচনাবলী" প্রকাশ করেন। শেষে এঁরা আবার চুক্তি করে আরো ৫০ হাজার সেট ছেপে বিক্রি করেন। এঁরা দ্বিতীয় বারে প্রথম বারের ছাপা হুবহু অফসেটে ছাপেন। এঁদের এই শেষের চুক্তির কথা আমি জানতাম না, আর তখন এই বই নিয়ে এঁদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না।

শরৎ সমিতি পরে আমাকে কিছু না জানানোয়, তার ফল হয় এই যে, প্রথম ৫০ হাজার সেটের বইয়ে যেসব মুদ্রাকরপ্রমাদ ইত্যাদি ছিল, পরের ৫০ হাজারের সেটেও সেইসব ভুলই থেকে যায়।

আরো বিপদ হয়েছে, শরৎ সমিতির "শরৎ-রচনাবলী" প্রকাশিত হওয়ার পরে অনেক প্রকাশকই নিজেরা আর কিছু পরিশ্রম না করে, শরৎ সমিতির বইকেই আদর্শ করে তাঁদের শরৎ-সাহিত্য ছেপে যাচ্ছেন। এঁদের কেউ শরৎ সমিতির কাছে ঋণ-স্বীকার করেছেন, আবার কেউ ঋণস্বীকার করেন নি। সে না হয় গেল। কিন্তু এঁরা শরৎ সমিতির বইকে আদর্শ করে নিজেদের বই ছাপায় এঁদের প্রকাশিত বইয়েও শরৎ সমিতির বইয়ের ওই মুদ্রাকরপ্রমাদ ইত্যাদি এসে গেছে।

শরৎ সমিতির "শরৎ-রচনাবলী" সম্পাদনাকালে তখন সময়ের অভাব বলেই "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার সঙ্গে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মিলিয়ে না দেখার জন্য, এখন দেখছি শরৎ সমিতির বইয়ের পাঠে ছোটো-বড়ো বেশ কিছু ভুল থেকে গেছে।

এখন দেখছি যে বললাম—এই দেখার অবশ্য একটা কারণও ঘটেছিল। সেই কারণ ইত্যাদির কথাই এখানে বিস্তৃত বলছি—

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, "শ্রীকান্ত—১ম পর্বে"র ইন্দ্রনাথ হলেন ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামাদের প্রতিবেশী রাজেন্দ্রনাথ

মজুমদার। শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় বেশ কয়েক বছর ভাগলপুরে মামার বাড়িতে ছিলেন, তখনই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয়।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরাও সকলেই জানেন, "শ্রীকান্তে"র শ্রীকান্ত চরিত্রে শরৎচন্দ্রের নিজের ছাপও অনেক রয়েছে। এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজেই একবার তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'একটা প্রবাদ আছে, শ্রীকান্ত বইখানা নাকি আমারই আত্মজীবনী।'

কবি কালিদাস রায় একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শ্রীকান্ত উপন্যাসে আপনার নিজের জীবনের কাহিনী কতটা আছে?

উত্তরে শরৎচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন—তা কিছুটা আছে বইকি। তবে কোনো কাহিনীকে সাহিত্যের পর্যায়ে আনার জন্য কোথাও-কোথাও কিছু-কিছু কল্পনাও যোগ করা হয়েছে।

শ্রীকান্ত উপন্যাস "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী" নামে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে এক চিঠিতে "ভারতবর্ষে"র মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কেও একরূপ ওই কথাই বলেছিলেন।

এবার শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ বা বাস্তব রাজেন্দ্রনাথের কথা কিছু বলি : শরৎচন্দ্রের মাতুল এবং বাল্যবন্ধু সুলেখক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিন" গ্রন্থে এই রাজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন—'ইন্দ্রনাথ একটি কাল্পনিক নাম। ইন্দ্রনাথকে আমরা রাজেন্দ্রনাথ বলিয়া জানি। তাঁহার ডাকনাম ছিল রাজু। রাজেন্দ্রনাথ আমাদের চেয়ে বয়সে পাঁচ-ছয় বৎসরের বড়ো ছিলেন। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশা সম্ভব হয় নাই। তবে দূরে থাকিয়া তাঁহার বীরত্বের কার্যকলাপ দেখিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে এবং আনন্দে বিমোহিত হইতাম।'

এই রাজেন্দ্রনাথ বা রাজুর এক ভাই মণীন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর একটি খাতায় "রাজুদার কীর্তি" নামে সাতটি কাহিনী লিখে গেছেন। এই কাহিনীগুলো নিয়ে আমি এক সময় "দেশ" পত্রিকায় দু সংখ্যায় "শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। মণিবাবুর লেখা ওই সাতটি কাহিনীর মধ্যে ভাগলপুরে গঙ্গায় জেলেদের জাল থেকে রাজুর মাছচুরির দুটি কাহিনীও আছে। একবার মাছচুরির কাহিনী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি প্রথমেই লিখেছেন 'রাজুদা একদিন বললেন, চল্ জেলেদের জাল থেকে কিছু মাছ নিয়ে আসি।

'গেলাম। এইভাবে গিয়ে মাঝে-মাঝে বিপদেও পড়তাম। জেলেরা গঙ্গায় মহাজাল ফেলে বড়-বড় মাছ আটকে রেখেছিল, রাজুদা এক-একটা করে গোটা দুই বড় রুই মাছ তাঁর ডিঙিতে তুলে নিলেন।'

জেলেদের জাল থেকে ইন্দ্রর মাছচুরির প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে লিখেছেন—'ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না, তখন এ-ধার হইতে ও-ধার পর্যন্ত উঁচু-উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই-কাৎলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

'দশ, পনের, বিশ সের রুই-কাৎলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চোখের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল।'

মণিবাবুর লেখায় জেলেদের জাল পড়লাম—মহাজাল। অথচ শরৎচন্দ্রের লেখায় দেখছি ওই জাল মায়াজাল। এখন কোন্‌টা ঠিক, এই সমস্যায় পড়ে ঠিক করলাম "শ্রীকান্ত—১ম পর্ব" বই হয়ে বেরোবার আগে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন শরৎচন্দ্র এই জালকে কী জাল বলেছিলেন দেখা যাক। এই স্থির করে "ভারতবর্ষ" পত্রিকা খুলে দেখি, শরৎচন্দ্র যেখানে পরিষ্কার লিখে গেছেন 'মহাজাল'।

শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন

'মহাজাল'। মণিবাবুও লিখেছেন 'মহাজাল', ভাগলপুরে ওই অঞ্চলের লোকের মুখেও শুনেছি ওই জাল মহাজাল। অন্যত্রও কারো-কারো কাছে শুনেছি, যে জাল দিয়ে বড়ো মাছ ধরা হয় বা যে জালে বড়ো মাছ জলে জিইয়ে রাখা হয়, তাকে মহাজালই বলে।

শ্রীকান্ত ১ম পর্ব বই হয়ে বেরুলে তাতে মুদ্রাকর-প্রমাদ ইত্যাদি কিছু-কিছু ছোটো-বড়ো ভুল থেকে যায়, যা শরৎচন্দ্র পরে আর কোনো দিনই লক্ষ করেন নি বা লক্ষ করলেও আলস্যবশত আর সংশোধনের চেষ্টাও করেন নি। ফলে সেসব ভুল আজও সমানে চলে আসছে। এই ধরনের ভুল যা শ্রীকান্ত-১ম পর্বের ২য় সংস্করণে দেখেছি, (সম্ভবত ১ম সংস্করণেও এই ভুলই ছিল, ১ম সংস্করণটি আমি পাই নি) তার কয়েকটা উল্লেখ করছি।

১. শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় লিখেছিলেন—'ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুৎগতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সে ইন্দ্রনাথ।'

শরৎচন্দ্র বই করার সময় বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে "ভারতবর্ষে"র এই লেখাই যে দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন বই বেরুল, তখন দেখা গেল, এই লেখাই ছাপা হয়েছে এইভাবে—'ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুৎগতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।

ফুটবল ম্যাচে মারামারির সময় শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে, এর আগে সে কোনোদিন তাকে দেখে নি বা তার নামও শোনে নি। তাই এখানে 'সেই ইন্দ্রনাথ' হবে কেন? এ ছাড়া আগে 'যে মানুষটি' বলা হয়েছে যখন, তখন শেষে 'সে মানুষটি' বা 'সে ইন্দ্রনাথ' হওয়াই তো স্বাভাবিক।

এখানে 'সে'র বদলে 'সেই' মুদ্রাকরপ্রমাদ বলেই মনে হয়। বইয়ে শরৎচন্দ্র এটা আর লক্ষ করেন নি। বা লক্ষ করলেও সংশোধনের কোনো চেষ্টা করেন নি।

২. শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন—'মিনিট দুয়ের মধ্যেই তাহার পিঠ ঘেঁসিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা আড়ম্বরে কহিল—পালা।'

নিঃসন্দেহ যে শরৎচন্দ্র এই লেখাই বইয়ের পাণ্ডুলিপি করেই দিয়েছিলেন। কিন্তু "শ্রীকান্ত ১ম পর্বের" ২য় সংস্করণ (১ম সং?) থেকেই দেখছি—এই লেখার 'মধ্যেই' হয়ে গেছে 'মধ্যে'।

আগের উদাহরণে 'সেই ইন্দ্রনাথ'য়ে যেমন একটা 'ই' বসেছে, এখানে আবার 'মধ্যেই'-এর 'ই'টা উঠে গেছে।

৩. শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিতেও নিশ্চয় দিয়েছিলেন, 'এমন আস্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপর কোনদিনও ভাঙে নাই।'

এইটাই বইয়ে একেবারে প্রথম থেকে ছাপা হয়েছে 'কোনদিনও'র জায়গায় 'কোনদিন'।

৪. শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিতেও রেখেছিলেন 'চড়াটার নাম শুনিয়াছি; কহিলাম, সতুয়া চড়া ত ঘোরনালার সুমুখে সে ত অনেকদূর।'

বইয়ে প্রথম থেকেই এই লেখায় 'সতুয়া চড়া' ছাপা হচ্ছে 'সতুয়ার চড়া' হয়ে। "ভারতবর্ষে" প্রথম লেখা "সতুয়া চড়া'-ই ঠিক বলে মনে হয়। কারণ আমি যখন প্রথমবার ভাগলপুরে যাই তখন সেখানে শরৎচন্দ্রের মামাদের একেবারে নিকট প্রতিবেশী ৮৪-বৎসর-বয়স্ক চণ্ডীচরণ ঘোষের কাছে জানি যে ওটা আসলে কোনো সতীর স্মৃতিবিজড়িত চড়া। তা থেকে বিহারী নাম হয়েছে সতুয়া চড়া।

৫. শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন 'প্রায়ই দেখিতেছি, এক-একটা জনার বা ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ছপাৎ করিয়া শব্দ হইতেছে, একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই হইতে সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম।'

বইয়ের পাণ্ডুলিপিতেও শরৎচন্দ্র নিশ্চয় এই লেখাই রেখেছিলেন। কিন্তু বইয়ে প্রথম থেকেই 'হাতের কাছেই'-এর পর পূর্ণছেদ বা দাঁড়ি দেওয়ায় বাক্যটা সম্পূর্ণ হয় না। তাই "ভারতবর্ষে"র লেখাটাই ঠিক ছিল বলে মনে করি। গুরুদাসের প্রকাশিত বইয়ের ৭ম সংস্করণে কেবল দেখছি কেউ নিজের বুদ্ধিতে 'হাতের কাছেই হইল।' লিখে পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে বাক্যটা সম্পূর্ণ করেছেন।

তিনি ভারতবর্ষে মূল লেখার কথা না জেনে বা না দেখে নিজের বুদ্ধিমতোই ঐরূপ করেছিলেন। এটা শরৎচন্দ্রের সংশোধন নয়, তাঁর সংশোধন হলে পরের সংস্করণেও এটাই থাকত।

এই গেল বইয়ের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে কয়েকটা ভুলের কথা।

৬. "শ্রীকান্ত ১ম পর্বে"র সমগ্র ৩য় পরিচ্ছেদটি প্রথম ১৩২২ সালের চৈত্র সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ওই ৩য় পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা নিয়ে ভক্তদের গান প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কেহ গাহিতে পারিল না; এমন পাষাণ গলাইয়া স্রোত বহাইয়া দিতে আর কোথাও শুনিলাম না।'

গুরুদাসের প্রকাশিত ২য় সংস্করণ (১ম সং?) সহ এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকাশকের প্রচলিত যতগুলি এ বই দেখেছি, সবেতেই দেখি, এই অংশটা ছাপা হয়েছে এইভাবে, 'যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল—এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।'

'কেহ গাহিতে পারিল না; এমন পাষাণ গলাইয়া স্রোত বহাইয়া দিতে আর'—এই অংশটি বাদ গেছে।

ভারতবর্ষের মূল লেখাটার মধ্যে দুটা 'আর' আছে। আমার অনুমান কমপোজিটর এই অংশটা কমপোজ করার সময় প্রথম 'আর' শব্দটা কমপোজ করে অন্যমনস্ক হয়ে তার পরের অংশটা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় আর-এর পরের অংশটা কমপোজ করেছিলেন। প্রুফশোধক ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি। পরে শরৎচন্দ্রও খেয়াল করেন নি। ফলে এই ভুল সমানে আজও চলে আসছে।

৭. শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিতে নিশ্চয় দিয়েছিলেন 'একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দিদি উঠানে বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহজীর মাথা। তাঁহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে।'

এই লেখায় 'উঠানে' এবং 'পড়িয়া' শব্দ দুইটি বইয়ে বাদ গেছে।

৮. ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তকে কিছু না জানিয়ে অন্নদাদিদির নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন 'পাছে তাঁহার এই স্নেহাস্পদ বালক দুটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়'…।

বইয়ে ৭ম পরিচ্ছেদের ১ম অনুচ্ছেদে এই লেখাটাই একেবারে প্রথম থেকে ছাপা হচ্ছে 'এই স্নেহাস্পদ'র বদলে 'সেই স্নেহাস্পদ' হয়ে।

শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর "ভারতবর্ষে"র প্রথম লেখায় কয়েকটা ভুল করেছিলেন। পরে অবশ্য বই করার সময় কিছু সংশোধন করে দেন, আবার দু-একটা সংশোধন করেনও নি। সেজন্যে সেসব ভুল আজও চলে আসছে। এখানে তারই উদাহরণ দিচ্ছি:

বইয়ের ২য় পরিচ্ছেদটি আগে ১৩২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে শরৎচন্দ্র লিখেছেন 'তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোর বেলায় সাঁতরে ওপারে গিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস্।'

বই করার সময় এই লেখায় 'ওপারে গিয়ে' সংশোধন করে লেখেন 'এপারে এসে'।

'গঙ্গার ধারে ধারে', এটা এখন অনেক বইয়ে

৩

ছাপা হচ্ছে 'গঙ্গার ধার ধরে।' শরৎচন্দ্র এটার কোনো অদল-বদল করেন নি।

শরৎচন্দ্র এই ২য় পরিচ্ছেদেই কেবল দু জায়গায় "শ্রীকান্ত"র নামের বদলে লিখেছিলেন "চন্দর"। (১) ইন্দ্রনাথের কথা—'ছ্যাখ চন্দর, কিছু ভয় নেই, ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস্ ঘিরে ফেললে বলে, আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ্ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল।' (২) জলমগ্ন চড়ায় ভুট্টা-জনারের খেতে ডিঙিতে বসে শ্রীকান্তর নিজের মনের কথা বা স্বগতোক্তি—'একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—চন্দর তুই একবার নেমে যা'।

এই মাছচুরি করতে আসার একটু আগেই ইন্দ্র শ্রীকান্তর পিসির বাড়িতে ছিনাথ বহুরূপীকে নিয়ে ঘটনাটার সময়ে সেখানে গিয়েছিল। তখন সেখানে শ্রীকান্তকে দেখে ইন্দ্র বলেছিল, 'তুই বুঝি এ বাড়িতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?'

এরপর শ্রীকান্তর সঙ্গে মাত্র কয়েকটা কথা বলেই ইন্দ্র তাকে সঙ্গে করে মাছচুরির কাজে ডিঙিতে নিয়ে আসে। অতএব যে একটু আগে শ্রীকান্ত বলেছে, সে একটু পরেই তাকে চন্দর বলবে কেন? আর শ্রীকান্ত একটু পরে ডিঙিতে বসে মনে-মনে বলবে কেন—'একবারও বলল না, চন্দর তুই একবার নেমে যা।' শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রর গঙ্গাতীরে নিজের ডিঙিতে নিয়ে আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা তিনি লিখেছিলেন ১৩২২ সালের মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে"। আর মাছচুরির ঘটনাটা ছাপা হয়েছিল "ভারতবর্ষে" একমাস পরে, অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের "ভারতবর্ষে"। তখন মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার লেখা দুটো শরৎচন্দ্র একসঙ্গে লেখেন নি। ফাল্গুন সংখ্যার লেখাটা লিখতে গিয়ে পরে তিনি সম্ভবত ইচ্ছে করেই শ্রীকান্ত না লিখে লিখেছিলেন চন্দর। শরৎচন্দ্র "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী" নাম দিয়ে তাঁর "শ্রীকান্ত—১ম পর্ব" বইয়ের প্রথমাংশের অনেকটা লিখেছিলেন রেঙ্গুনে বসে। "ভারতবর্ষ" পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়-কে লেখা শরৎচন্দ্রের ওই সময়কার দুটো চিঠির কিছু-কিছু এখানে উদ্‌ধৃত করছি। প্রথম চিঠিতে লেখেন—শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী যে সত্যই ভারতবর্ষ ছাপিবার যোগ্য, আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না।...যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে।' এই চিঠি ১৫. ১১. ১৯১৫ তারিখের।

এরপর ৭. ১২. ১৯১৫ তারিখে দ্বিতীয় চিঠিতে লেখেন—'একটা ছোট গল্প পাঠাইয়া দিব। কারণ অসম্পূর্ণ গল্প আপনাকে আমিও পাঠাইতে চাহি না এবং তাহা সম্পূর্ণ হইবার ভরসায় ছাপাইতে বলিতেও আমি পারি না। তবে চন্দর কাণ্ডের কাহিনী স্বতন্ত্র।'

ওই চিঠি দুটি থেকেও বোঝা যায়—শরৎচন্দ্র মাঘ সংখ্যা "ভারতবর্ষে"র জন্য লেখাটা আগে এবং ফাল্গুন সংখ্যার লেখাটা পরে লিখেছিলেন। ধারাবাহিক রচনা "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী"র ফাল্গুন সংখ্যার লেখাটায় শরৎচন্দ্র নিজেই শ্রীকান্তের বদলে চন্দর লিখেছিলেন বলেই, তখন তিনি হরিদাসবাবুকেও চিঠিতে লিখেছিলেন—'তবে চন্দর কাণ্ডের কাহিনী স্বতন্ত্র।'

বইয়ের নাম "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী"। লেখায় প্রথম যে অংশ মাঘ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হয়, তাতে শরৎচন্দ্র দু জায়গায় শ্রীকান্তর নাম 'শ্রীকান্ত'ই লেখেন। চন্দর লেখেন নি।

তাই এখন প্রশ্ন: শরৎচন্দ্র হঠাৎ "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী"র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীকান্ত না লিখে চন্দর লিখলেন কেন? আর কেনই বা হরিদাসবাবুকে লিখলেন 'চন্দর কাণ্ডের কাহিনী'? তবে কি শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' কে 'চন্দর কাণ্ডের কাহিনী' বলে লিখবার কথাও শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে তখন উঁকি দিয়েছিল?

এবার শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখলেও পরে বই করার সময় সংশোধন করেন নি এবং আজও যা চলে আসছে, তারই উদাহরণ দিচ্ছি।

শরৎচন্দ্র ১ম পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকে ইন্দ্র-নাথের সিগারেট খাওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'আচ্ছা তা হলে সিগারেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা দুই সিগারেট ও দেশলাই বাহির করিয়া একটি আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফেলে?'

এখানে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের জবানিতে ইন্দ্রনাথের সিগারেট খাওয়ার কথা বলেও পরে সঙ্গে-সঙ্গে 'চুরুট খাওয়ার' কথা বললেন। সিগারেট এবং চুরুট দুটি তো আলাদা? নাকি?

শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন—'ও তাইত কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়লে ডিঙি শুদ্ধ আমরা শুদ্ধ সব গুঁড়িয়ে যাব।' এই লেখাটা বইয়ের ২য় পরিচ্ছেদে আছে। ২য় সংস্করণ বইয়েও দেখছি, এই লেখাই হুবহু ছাপা হয়েছে। পরে বইয়ের কোনো প্রুফ-সংশোধকই 'আমরা শুদ্ধ'র শুদ্ধটা তুলে দিয়ে করে দেন 'ডিঙি শুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব'। এবং এখনকার বইয়ে এইটাই ছাপা হচ্ছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র যে লিখলেন, 'কাল জল হয়ে গেছে'—কিন্তু একটু আগেই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এই মাছচুরি করতে আসার রাত্রিটার সন্ধ্যায় সময়কার কথায় শরৎচন্দ্র নিজেই তো লিখেছেন—'সারাদিন অবিশ্রান্ত (ভারতবর্ষে ছিল অবিশ্রাম) বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে।'

এখানে শরৎচন্দ্র যদি গতকাল বৃষ্টি হওয়ার কথা রেখেও লিখতেন—কাল জল হয়ে গেছে, আজও সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছে, তাই আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না—তাহলেই মনে করি বলাটা ঠিক হত। শরৎচন্দ্র এখানে আজ সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের কথাটা একেবারে ভুলে গেছেন।

এম. সি. সরকার অ্যানড সন্সের "শরৎসাহিত্য সংগ্রহে"র "শ্রীকান্ত ১ম পর্বে"র সপ্তম মুদ্রণেরই কেবল প্রুফ-সংশোধক শরৎচন্দ্রের এখানে এই 'কাল'টা ধরে-ছিলেন, তাই তিনি ওই ৭ম মুদ্রণের বইয়ে করে দেন —'ও তাই ত কালো জল হয়ে গেছে।' কালো অর্থাৎ কাল-ও।

শরৎচন্দ্রের কেন এ ভুলটা হল? এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—এই বইয়ের শুধু প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা যাতে 'কাল জল হয়ে গেছে' আছে,—এটা পরের মাসের "ভারতবর্ষে" ছাপা হয়ে-ছিল। মনে হয় এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা লেখার সময়, আগে যে লিখেছিলেন—'সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছে'—এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই ওই সারাদিনের বৃষ্টির কথাটা আর লেখেন নি।

শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় লিখেছিলেন—(ইন্দ্র) 'কহিল, চুপ শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এ দিকে আসবে—ঐ ছ্যাখ। তাই তো বটে। প্রবল জলতাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া তিনখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে।'

"শ্রীকান্ত ১ম পর্বে" ২য় সংস্করণেও (১ম সং?) দেখছি হুবহু এই লেখাই ছাপা হয়েছে। এখানে একটা কথা—ইন্দ্র বলল, চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসবে—ওই দ্যাখ। ইন্দ্রর এই কথা শুনে শ্রীকান্ত নৌকা দেখে যখন বুঝল বা বুঝে বলল তাই ত বটে, তখন শ্রীকান্তের দৃষ্টিতে চারখানা না হয়ে আবার তিনখানা হবে কেন? চারখানা হওয়াই তো ঠিক?

তবে এখানে এ সম্পর্কে শুধু বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া

নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল—চুপ……' ইত্যাদি। নৌকাখানা আরো খানিকটা ভুট্টা-জনারের খেতের ভিতর পাঠিয়ে দেওয়ায় শ্রীকান্ত সেই ভুট্টা-জনারের খেতের ভিতর থেকে হয়তো তিনখানা নৌকা দেখতে পেয়েছিল, গাছের আড়ালে একটা দেখতে পায় নি। তাই তিনখানা দেখার কথা হয়েছে।

শ্রীকান্ত ১ম পর্ব—২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এখন একদিকে যেমন দেখছি—শরৎচন্দ্র নিজেই লক্ষ না করায় বইয়ে প্রথম থেকেই কিছু ভুল চলে আসছে, তেমনি এই বইটি পেয়ে আবার সুষ্ঠু পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে অনেক উপকারও হয়েছে। সেই পাঠ-উদ্ধারের কয়েকটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি—

শরৎচন্দ্র "শ্রীকান্ত ১ম পর্ব" বইয়ের ৩য় পরিচ্ছেদে এক জায়গায় লিখেছিলেন—'দক্ষিণ দিকের চরের বিস্তৃতি বশত এ জায়গায় একটি ছোটখাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উভয়দিকের মুখ খোলা ছিল।'

গুরুদাসের বই থেকে শুরু করে যত প্রকাশকের বই পেয়েছি, সবেতেই দেখেছি 'উভয়দিকের মুখ খোলা'র বদলে 'উত্তর দিকের মুখ খোলা।'

এখন ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এর সঙ্গে "ভারতবর্ষে"র লেখা মিলিয়ে দেখলাম দু জায়গাতেই আছে 'উভয় দিক'। ২য় সংস্করণের বইটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যে, শরৎচন্দ্র 'উভয় দিকই' লিখেছিলেন। এই ভুলটা মুদ্রাকরপ্রমাদ বা প্রুফ-সংশোধকের কাজ।

শ্রীকান্তের ১ম পর্বের ৮ম পরিচ্ছেদে এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—'মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সজল হাসির আভা দেখা দিল।'

এইটাই এখন বাজারে প্রচলিত সমস্ত বইয়েই ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে—'সজল হাসি'র পরিবর্তে 'সহজ হাসি'। 'মেঘলা জ্যোৎস্না'র মতো যখন, তখন 'সজল হাসি' হওয়াই তো স্বাভাবিক।

২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে দেখছি তাতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে 'সজল হাসি'। এখানে সেই মুদ্রাকর-প্রমাদ বা প্রুফ-সংশোধকের কাণ্ড।

বইয়ে ওই ৮ম পরিচ্ছেদেই শরৎচন্দ্র মুমূর্ষু নিরুদিদির প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—'নিরুদিদি স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া হাতদুলিয়া আমার কানটা তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন—শ্রীকান্ত, তুই বাড়ি যা।'

এখনকার সমস্ত বইয়ে 'স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে' ভুল হয়ে ছাপা হচ্ছে 'স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে' হয়ে। এখানেও ওই মুদ্রাকরপ্রমাদ অথবা প্রুফ-সংশোধকের ভুল।

গুরুদাসের বইয়ের ৭ম সংস্করণের প্রুফ-সংশোধক একজন মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে 'মুক্তকণ্ঠ' হতে পারে না, ভেবেই হয়তো করেছিলেন 'স্বাভাবিক কণ্ঠে'। ওই প্রুফ-সংশোধক ভারতবর্ষের লেখা বা ২য় সংস্করণের পাঠ না দেখে বা দেখার সুযোগ না পেয়ে নিজের বুদ্ধিতেই এটা করেছিলেন। 'স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে' করেছেন 'স্বাভাবিক স্নিগ্ধকণ্ঠে'।

বইয়ের ওই ৮ম পরিচ্ছেদেই শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—'কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল, সে হাজির হইলেই আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত; উঠিয়া গিয়া তবে স্বস্তি পাইতাম।'

এখনকার সমস্ত বইয়ে 'তবে স্বস্তি পাইতাম'-এর 'তবে'টা নেই। শুধু আছে স্বস্তি পাইতাম।

"ভারতবর্ষে"র প্রথম লেখায় এবং ২য় সংস্করণের বইয়েও 'তবে' আছে দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, শরৎচন্দ্রের মূল লেখা থেকে যে-কোনো কারণেই হোক 'তবে' বাদ গেছে। শরৎচন্দ্র ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় (পৃ ৯২৯) লিখেছিলেন—

'পিয়ারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তাহলে তাঁবু থেকে তোমাকে ভূতে উঠিয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও?'

'না, তা বলতে চাইনে, উড়িয়ে কেউ আনেনি; নিজেই পায়ে হেঁটে এসেছি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, সকল প্রকাশকের বইয়েই 'ভূতে'টা নেই। আর 'নিজেই'-এর জায়গায় হয়েছে 'নিজের'।

প্রথম প্রকাশক গুরুদাসের ২য় সংস্করণের বইয়ে যখন দেখলাম "ভারতবর্ষে"র লেখাই হুবহু ২য় সংস্করণেও ছাপা হয়েছে, তখন পরিষ্কার বোঝা গেল —পরে যেভাবেই হোক বিকৃতি ঘটেছে। শরৎচন্দ্র নিজে কিছুই করেন নি এবং পরে তিনি এটা লক্ষও করেন নি।

দ্বিতীয় সংস্করণের বইটি না পেলে এই বিকৃতিটা কিছুতেই ধরা পড়ত না। মনে হত—হয়তো শরৎচন্দ্রই ঐরূপ বদল করে গেছেন।

এখনকার সমস্ত বইয়ে ছাপা হয়েছে—'অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া ও-দিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল।' (১২শ পরিচ্ছেদ)

এই লেখায় 'ওদিকে দরজার কোণে'র জায়গায় শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন—'ও-দিকের দরজার কোণে'। ২য় সংস্করণের বইয়েও দেখেছি আছে 'ও-দিকের দরজার কোণে'—এই দেখে বোঝা গেল যে শরৎচন্দ্র 'ও-দিকের'ই লিখেছিলেন। 'ও-দিকের' পরে কিভাবে 'ও-দিকে' হয়ে গেছে।

পাঠ উদ্ধারের ব্যাপারে ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এই যেমন কিছু উপকার হয়েছে, তেমনি ২য় সংস্করণের বই পেয়েও কয়েকটা ক্ষেত্রে প্রকৃত পাঠ নিয়ে সন্দেহ থেকেও যাচ্ছে, নিশ্চিত হতে পারা যাচ্ছে না। যেমন —"শ্রীকান্ত ১ম পর্ব" গ্রন্থের ১২শ পরিচ্ছেদে এক জায়গায় এ পর্যন্ত সকল প্রকাশকের বইতেই, গুরুদাসের ওই ২য় সংস্করণেও (১ম সং?) আছে—'একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম।'

'বহুলোকের ব হুবিধ কামনা-সাধনার উপহার রাশি এমনি ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিপাত মাত্রই মনে হয় এই অচেতন জিনিস-গুলোর মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যেন এই বাড়ির মধ্যে একটুখানি জায়গার জন্য এমনি ভীড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেষারেষি ঠেলাঠেলি করিতেছে।'

গুরুদাসের ৭ম সংস্করণের বইয়ে ছাপা হয়েছে 'একদিন সকালে একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া', 'পিয়ারীর বাড়ি'—বাদ। অথচ "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রথমে শরৎচন্দ্রের যে "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী" প্রকাশিত হয়, তাতে এই লেখাটায় ছিল—'একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি এবং ঘরে ঘরে ঘুরিয়া'র জায়গায় ছিল 'একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি এবং ঘরে ঘরে ঘুরিয়া' আর 'বহু লোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার' জায়গায় ছিল 'বহু লোকের বহুবিধ কামনা-বাসনার।' এখানে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" যা লিখেছিলেন সেটাই ঠিক।

শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন—'সহসা মনে হইল, তাইত। তাঁহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অন্ত্যজ হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য?'

এই লেখায় 'অন্ত্যজ হীন অন্তেবাসীর মত' অংশটা সেই ১৩২৫ সালের ২য় সংস্করণের (১ম সং?) বই থেকে শুরু করে আজও সবার বইয়েই ছাপা হচ্ছে 'অত্যন্তহীন অন্তেবাসীর মত'। শরৎচন্দ্র বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে 'অন্ত্যজ'ই রেখেছিলেন। পরে ছাপা হলে বইয়ের এই ভুলটা তিনি আর কোনোদিনই লক্ষ করেন নি।

এই দৃঢ় ধারণা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—

শরৎচন্দ্র এখানে যার নির্বা ক আহ্বানের কথা বলেছেন, একটু আগেই বইয়ে তার আহ্বানের প্রসঙ্গে লিখছেন 'সেই ধূলাবালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল, ছি-ছি ; ও তুই কি করিলি ? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সেকি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য ? আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়। এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিস না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস।'

এখানে আহ্বানকারীই তো শ্রীকান্তকে বলেছে—'অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসিস না' —অতএব শ্রীকান্তও যখন আহ্বানকারীর কথা স্মরণ করে বা পুনরাবৃত্তি করে বলছে, তখন সে তো 'অন্ত্যজ হীন অন্তেবাসী'ই বলবে।

এখনকার সকল প্রকাশকেরই এই বইয়ের ৯ম পরিচ্ছেদের ১ম অনুচ্ছেদে প্রথমেই লেখা হয়েছে, 'মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সেকাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শু.নয়া লজ্জায় আর বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয় ; পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই।'

এই লেখায় 'আমার শুধু নিজের মনটাই নয়'-এর স্থানে শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন 'আবার শুধু নিজের মনটাই নয়'। ২য় সংস্করণের থেকে বোঝা যায় পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের লেখা 'আবার'। বইয়েও দেখেছি 'আবার'ই আছে। 'আমার' করা হয়েছে। গুরুদাসের বইয়ে ৭ম সংস্করণেও 'আবার' আছে।

ওই প্রথম অনুচ্ছেদেই শেষ দিকে এখনকার সব বইয়েই ছাপা হচ্ছে—'তোমার কোটী-কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞান-ভাণ্ডটুকু এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, একথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না।'

এই লেখায় 'হঠাৎ জাগরিত হইয়া'র স্থানে শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষে" প্রথমে লিখেছিলেন 'হঠাৎ জাগ্রত হইয়া'। ২য় সংস্করণেও তাই আছে।

২য় সংস্করণের (১ম সং ?) বই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল বইয়েই ছাপা হচ্ছে 'এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে' ; এইটাই কিন্তু শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন এইভাবে—'এক মুহূর্তে গুঁড়া না করিয়া দিতে পারে।'

এখানেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে—তাহলে কি শরৎচন্দ্র নিজেই ভারতবর্ষের লেখা নিয়ে বই করার সময় ভারতবর্ষের ওই লেখা থেকে 'না' তুলে দিয়েছিলেন, না, প্রুফ-সংশোধক এ কাজ করেছিলেন ?

আমরা তো জানি, বাঙলা ভাষায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য সেই বাক্যের পরে 'না' বসিয়ে তার ক্রিয়া দেখানো হয়। যেমন—শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।' এখানে 'না'র অর্থ সত্যকার 'না' নয়, বরং 'হাঁ'ই।

শরৎ সমিতির "শরৎ রচনাবলী" সম্পাদনা-কালে ওই রচনাবলীর ৫ম খণ্ডের শেষে 'শরৎসাহিত্যের পাঠোদ্ধার' নামে যে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তাতে এক জায়গায় লিখেছিলাম—

'শরৎ-সাহিত্যে'র পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন, তিনি লেখার মধ্যে বক্তব্যকে জোরালো এবং শ্রুতিমধুর করবার জন্য বাক্যের মধ্যে কোনো-কোনো শব্দের শেষে ই, ও, ত প্রভৃতি দিয়েছেন। এখনকার প্রচারিত শরৎসাহিত্যে বহু ক্ষেত্রেই সেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। যেমন "শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে"র প্রথম পাতাতেই তিনি লিখেছেন 'এমনি করিয়াই কি চির-জীবন কাটিবে ?' —এর 'এমনি করিয়াই'-টা এখন ছাপা হচ্ছে 'এমন করিয়া'।

২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এই বইয়ের লেখার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'ভারতবর্ষে"র প্রথম লেখা মেলাতে গিয়ে দেখছি, ২য় সংস্করণের বইয়েও এইরূপ ই, ও, ত প্রভৃতি অনেক বাদ গেছে। যেমন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের সাময়িক বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন—

'তারপর অনেকদিন সেও আমার সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথে ঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমনি করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতেই পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই ত শুধু সারাদিন তুষের আগুনের দগ্ধ করিত, তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত।'—এই অংশটা বইয়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১ম অনুচ্ছেদ। এই লেখায় 'আমার সন্ধান করিল না'—হয়েছে 'আর সন্ধান করিল না, এবং 'দেখিতেই 'দেখিতে' হয়ে বইয়ে ছাপা হচ্ছে, আর 'আমাকেই ত শুধু'র 'ত' বাদ গেছে। ২য় সংস্করণের বইয়ে 'আমার সন্ধান করিল না' থাকলেও 'দেখিতেই'-এর 'ই' এবং 'আমাকেই ত শুধু'র 'ত' বাদ গেছে। ২. শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রথমে লিখেছিলেন—'বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়েই তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। আর, আর একজন আমাদেরই কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল।'—১৩২৩, পৃ '১। শাহজীকে কবর দেওয়ার পরের এই ঘটনাটা বইয়ের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে রয়েছে। এই লেখায় 'হৃদয়েই' এবং 'আমাদেরই' শব্দ দুটি থেকে শেষের 'ই' এবং 'আর, আর একজনই' এর কমাচিহ্ন সমেত প্রথম আর শব্দটা একেবারে ২য় সংস্করণ (১ম সং ?) থেকেই নেই। ৩. বইয়ের ৯ম পরিচ্ছেদের শেষ বাক্য সেই ২য় সংস্করণ থেকেই আজও সর্বত্র ছাপা হচ্ছে—'সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙা ঘাটের উপর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।'

শরৎচন্দ্র "ভারতবর্ষে" তাঁর প্রথম লেখায় 'তাহার পদশব্দ'র বদলে লিখেছিলেন 'তাহারই পদশব্দ'।

২য় সংস্করণের বইয়ে যে এই ধরনের ভুলগুলো ছিল, শরৎচন্দ্র পরে তা লক্ষ করেন নি, কিংবা লক্ষ করলেও তা আর সংশোধনের চেষ্টা করেন নি।

৪. শরৎচন্দ্র প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন—

'বড় ঘুম পেয়েছে ইন্দ্র, বাড়ি ফিরে চল না ভাই। ইন্দ্র বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই। কি করব শ্রীকান্ত আজ একটু দেরি হবেই—অনেক কাজ আছে। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন, এখানেই একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না।'

এইটাই বইয়ে ৩য় পরিচ্ছেদের প্রথমেই ছাপা হয়েছে। কিন্তু একেবারে ২য় সংস্করণের (১ম সং ?) বই থেকেই আজও এই লেখায় 'ঐখানেই' ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে 'ঐখানে'। ৫. এই ৮ম পরিচ্ছেদেই শেষদিকে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—এক 'বিলাত-ফেরত' 'একঘরের' বাড়িতে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হলে শ্রীকান্ত প্রভৃতি সেই মৃতদেহ দাহ করতে যায়। এতে স্থানীয় সমাজপতিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—এজন্য শ্রীকান্তদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শ্রীকান্ত ও তার দল তখন স্থানীয় ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হয়। তিনি বিনা দক্ষিণায় বাঙালির বাড়িতে চিকিৎসা করতেন। ডাক্তারবাবু শ্রীকান্তের কথা শুনে রেগে গিয়ে প্রকাশ করেন—তিনি ঐ সমাজপতিদের বাড়িতে আর চিকিৎসা করতে যাবেন না ডাক্তারবাবুর এই ঘোষণা শুনে সমাজপতিরা শ্রীকান্তদের উপর থেকে প্রায়শ্চিত্তের দণ্ডাদেশ তুলে নেন।

এর পরের কথায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন—প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নেই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দুটা দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন, সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ, অর্থাৎ কাহারও বাটিতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটিতে এক-এক বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই, কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুরও আর ক্রোধ ছিল না।'

এখানে উদ্‌ধৃত এই লেখাটা প্রথমে "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ২য় সংস্করণের (১ম সং?) বই থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সব বইয়েই দেখা যাচ্ছে 'ডাক্তারবাবুরও'র জায়গায় 'ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না।' 'ও' উঠে গেছে।

এমনকী সরকারের ৭ম মুদ্রণের বইয়ে আবার 'ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান' ছাপা হয়েছে 'ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যান' হয়ে। 'না' শব্দটা উঠে যাওয়ায় উল্টো অর্থ দাঁড়িয়েছে।

এখনকার প্রচলিত সমস্ত শ্রীকান্ত ১ম পর্ব বইয়েই এখানে আলোচিত এই ভুলগুলো তো বটেই, এছাড়া আরো কিছু-কিছু এই ধরনের ছোটোখাটো ভুল চলে চলে আসছে। এই বইয়ের নির্ভুল পাঠের জন্য এগুলো সংশোধন হওয়া একান্তই প্রয়োজন। মূল লেখায় শরৎচন্দ্র নিজে যেখানে কিছু ভুল করেছেন, তাতে হাত না দিয়ে, সেখানে মন্তব্য করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকাশকরা বইয়ে যেসব ভুল করেছেন, সেগুলোর সংশোধন দরকার। দীর্ঘকাল ধরে বইয়ে প্রকাশকের কৃত ভুল চলতে থাকলে পাঠক-পাঠিকারা নিঃসন্দেহেই মনে করবেন শরৎচন্দ্র নিজেই এইসব ভুল লিখে গেছেন।

যেমন, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-মাধ্যমিকের বাঙলা সংকলন গ্রন্থে শ্রীকান্ত ১ম পর্বের সমস্ত ২য় পরিচ্ছেদটি নিয়ে "নৈশ অভিযান" নাম দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য করা হয়েছে। ওই ২য় পরিচ্ছেদের এক স্থানে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসঙ্কুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাতক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা।'

'বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল।'

এই অংশটার 'আমার বীরহৃদয়' মাধ্যমিকের বাঙলা সংকলন-গ্রন্থে ছাপা হয়েছে 'আমাদের বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল'। মাধ্যমিকের একজন বাংলা শিক্ষকমহাশয় 'আমাদের বীরহৃদয়'—দেখে বলেছিলেন 'দেখুন তো মশায়, শরৎচন্দ্র কী সব ভুল লিখেছেন।'

শিক্ষক মহাশয়কে বললাম—শরৎচন্দ্র কোথাও 'আমাদের বীরহৃদয়' লেখেন নি। লিখেছেন 'আমার বীরহৃদয়'।

আমার এই কথা শুনে শিক্ষকমশায় আশ্বস্ত হন। কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আরো একটা অভিযোগ এনে বললেন—তিনি লিখেছেন, 'তবে মাছ চুরি করে কাজ নেই ভাই—বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল।' অথচ তিনি এর আগেই লিখেছেন 'লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে—সে যে কত বড় পাকা মাঝি'···ইত্যাদি।

একজন পাকা মাঝি হাল ধরে থাকলে, দাঁড়ি দাঁড় তুলে নিলেও নৌকা কখনই পাক খেয়ে পিছিয়ে যেতে পারে না। শরৎচন্দ্রের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি এখানে ভুল লিখে গেছেন।

সেদিন ওই শিক্ষকমশায়কে বলেছিলাম, শরৎচন্দ্র বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন এবং লিখেছেনও—তিনি তাঁর জানা জিনিস ছাড়া লেখেন নি।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বলছি। ভাগলপুরের গঙ্গা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে চলেছে। এখানে জোয়ারভাটা না থাকায় গঙ্গা সমানেই পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বয়ে যাচ্ছে। ভাগলপুরের অদূরে পশ্চিমে এই গঙ্গার একটা শাখা বেরিয়ে ভাগলপুরের গা দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। গঙ্গার এই শাখাকে ভাগলপুরের লোকেরা গঙ্গা, গঙ্গার ছাড়, আবার যমুনিয়া—এও বলে থাকে। ইন্দ্র এবং শ্রীকান্ত মাছ চুরি করার জন্য ডিঙি নিয়ে রওনা হয় যমুনিয়ার দক্ষিণ তীর থেকে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের জবানিতে লিখেছেন 'আমাদের নৌকা কোনাকুনি পাড়ি দিতেছে।'

বর্ষার যমুনিয়ায় বা গঙ্গায় স্রোত তো আছেই, আর যমুনিয়ার দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে ইন্দ্ররা রওনা হয়েছিল, সেই দিকেই 'গঙ্গায় ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।' তাই কোনাকুনি যাত্রায় ইন্দ্র হাল ধরে থাকলেও দাঁড় তুলে নিলে যমুনিয়ার বা গঙ্গার ভীষণ স্রোতে ছোটো ডিঙি পাক খাবেই। আর যেহেতু গঙ্গার ভীষণ জল-স্রোত অর্ধবৃত্তাকারে দক্ষিণের তীর ঘেঁষে চলেছে, তাই পাক খাওয়া সম্ভব।

আমি এই কথা বলায় সেদিন ওই শিক্ষকমশায় শরৎচন্দ্র নির্ভুল লিখেছেন বলে স্বীকার করেছিলেন।

উচ্চ-মাধ্যমিকের বাঙলা সংকলন-গ্রন্থের "নৈশ অভিযানে" এমন ভুল আরো কয়েকটা আছে—'কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি।' "নৈশ অভিযানে" এই লেখার শেষের 'কত'-টা বাদ গেছে।

শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল?' কিন্তু "নৈশ অভিযানে" 'ওই'-এর জায়গায় 'ও পাথরের' ছাপা হয়েছে।

শরৎ সমিতির "শরৎ রচনাবলী" সম্পাদনাকালে তখনকার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত আর বিক্রীত এম. সি. সরকার অ্যানড সন্সের "শরৎ সাহিত্য-সংগ্রহ" নিয়ে তাতে ভুলগুলো সংশোধন করে, সেই সংশোধিত বইই পাণ্ডুলিপি হিসাবে প্রেসে দিই। শ্রীকান্ত ১ম পর্বের ক্ষেত্রেও তাই করি। এইভাবে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিলেও শরৎ সমিতির বইয়ের প্রুফ সংশোধকেরা নিজেরাই কয়েকটা বানানে একটু-আধটু ভুল করেছেন। যেমন, এম. সি. সরকারের শ্রীকান্ত ১ম পর্বের ২য় পরিচ্ছেদে 'পুতিয়া' বানান ঠিক থাকলেও শরৎ সমিতির বইয়ে হয়েছে পুঁতিয়া। এই পুঁতিয়া ভুল বানান ২য় পরিচ্ছেদে কয়েকবারই বসেছে।

এম. সি. সরকারের বইয়ে (যা আমাদের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি) 'ডিঙাইয়া' বানান থাকলেও শরৎ সমিতির প্রুফ-সংশোধকরা একে করেছেন 'ডিঙ্গাইয়া'। ওই ২য় পরিচ্ছেদের একটা অনুচ্ছেদে বানানে 'নৌকাগুলি' এবং 'অনেকগুলি' থাকলেও শরৎ সমিতির প্রুফ-সংশোধকদের ভুলে একবার 'নৌকাগুলি' একবার 'নৌকাগুলো' এবং 'অনেকগুলো' ছাপা হয়েছে। শরৎ সমিতির বইকে আদর্শ করে যাঁরা বই ছাপছেন, তাঁরাও ওই ভুলগুলো করেছেন। ফলে "নৈশ অভিযানে"ও তাই হয়েছে।

এম. সি. সরকারের এখানে আলোচ্য "শ্রীকান্ত—১ম পর্ব"র ২য় পরিচ্ছেদের প্রচুর ভুল সংশোধন করে দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের পাণ্ডুলিপিতে কীভাবে একটা ভুল চোখ এড়িয়ে যায়। সেটা হল 'দমকা মারিয়া'। এটা হওয়া উচিত 'দমক্ মারিয়া'। শরৎচন্দ্র এই-ই লিখেছেন। শরৎ সমিতির বইকে যাঁরা আদর্শ মেনেছেন, তাঁরা, এমনকী উচ্চ মাধ্যমিকের বাঙলা বইয়েও এই ভুলই রেখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র ওই ২য় পরিচ্ছেদেই প্রথমে "ভারতবর্ষে" লিখেছিলেন—'প্রকৃতি দেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর-রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই।' 'ইন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জানলে আবার

ভয় কিসের! প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়।'

১৩২৫ সালে প্রকাশিত "শ্রীকান্ত ১ম পর্ব"র ২য় সংস্করণে দেখছি—ঠিক এই লেখাই আছে। কিন্তু এখনকার বইয়ে 'বয়স তাহা নহে'র বদলে 'বয়স তাহাদের নহে' এবং 'আজিও'র জায়গায় 'আজও ভুলিতে পারি নাই' ছাপা হয়েছে। আর 'প্রত্যুত্তরে আমি শুধু'র 'শুধু'টা বাদ গেছে।

এখনকার প্রচলিত বইয়ের ২য় পরিচ্ছেদের ভুলগুলো নিয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনার হেতু—এই অংশটা "নৈশ অভিযান" নামে উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য আছে বলেই।

সবশেষে একটা কথা—এই প্রবন্ধে পরলোকগত লেখক শরৎচন্দ্রের সামান্য দু-একটা ভুল বা অবহেলার কথার সঙ্গে কয়েকজন প্রকাশক এবং তাঁদের নিযুক্ত প্রুফ-সংশোধকদের নানা ত্রুটির কথা বলেছি। এই ভুল দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এখন প্রকাশকরা আমার উপর ক্ষুণ্ণ হবেন কি হবেন না—জানি না। তবে এটা জানি যে ভুল দেখিয়ে দিলে অনেকে খুশিই হন এবং নির্ভুল হওয়ার সুযোগ পান। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

আমার "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে আমি প্রখ্যাত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী" গ্রন্থের কয়েকটা ভুলের উল্লেখ করেছিলাম। প্রভাতবাবু তখন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি এবং আপনি আমার যেসব ভুল ত্রুটি দেখিয়েছেন—তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

"শ্রীকান্ত—১ম পর্বে"র ২য় পরিচ্ছেদটি যেমন উচ্চ-মাধ্যমিকের পাঠ্য, তেমনি এই বইয়ের ছিদাম বহুরূপীর কাহিনী বা নতুনদার কাহিনী প্রায়ই বহু স্কুলপাঠ্য বইয়েরও অন্তর্ভুক্ত হয়। তা ছাড়া "শ্রীকান্ত—১ম পর্ব" বইটি দীর্ঘকাল ধরেই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. এবং এম. এ. ক্লাসেও পাঠ্য হয়ে আসছে, পরেও হবে।

আজ পর্যন্ত এ বই বহু লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে এবং কোটি-কোটি মানুষ পড়েছেন আর পরেও ছাপা হবে এবং আরো কত মানুষ পড়বেন। তাই বর্তমান আর ভাবী কালেরও ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের মুখ চেয়েই এই প্রবন্ধে যতটা পেরেছি, "শ্রীকান্ত—১ম পর্ব" বইয়ের একটা শুদ্ধ পাঠের কথা বলেছি।

গোপালচন্দ্র রায় (জন্ম ১২. ৪. ১৩১৬) সুলেখক ও নিষ্ঠাবান সাহিত্য-গবেষক। এ পর্যন্ত চল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "শরৎচন্দ্র" (তিন খণ্ড), "বঙ্কিমচন্দ্র" (দুই খণ্ড), "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী", "জীবনানন্দ" ইত্যাদি। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার-স্থাপিত ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে একটানা ৩৬ বছর কর্মরত।

স্বপ্ন

মীনাক্ষী ঘোষ

আমি খুব স্বপ্ন দেখি। সূর্য বলে, 'তুমি ঠিকমত ঘুমোতে জান না, তাই রোজ স্বপ্ন দেখ। আমি তো কই এত স্বপ্ন দেখি না।' দরকার নেই বাপু আমার ঘুমুতে জেনে। কী সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন আমার। খারাপ স্বপ্ন আমি দেখিই না। কেবল কাল রাত্রে হঠাৎ করে একটা দুঃস্বপ্ন এসে গেল। সেই থেকে মনটা খারাপ হয়ে আছে। আসলে এই দুঃস্বপ্নের জন্য দায়ী ময়ূরদি। সে কেন যে কেবল বাজে গল্প শোনাতে ভালোবাসে!

সকালবেলা পেঁয়াজ কাটছিলুম একরাশি। সূর্য মাংসের দো-পেঁয়াজি খাবে বলেছে। এমন সময় ময়ূরদি এসে হাজির। দাদা-বউদির সংসারে তার বেশি কাজ নেই, তাই যখন-তখনই আমাদের ফ্ল্যাটে হাজির হয়। কিন্তু তখন গল্প করার একটুও সময় নেই, সূর্যর টিফিন দিতে হবে। বললুম, 'ময়ূরদি, এখন পেঁয়াজ কাটছি। তোমার চোখে কাঁজ লাগবে। একটু পরে গল্প করব তোমার সাথে।' ময়ূরদি তবু দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'একটা খুব জবর-খবর আছে রে অনু, তোকে জানিয়ে যাই।' গল্পের গন্ধে আমারও হাতের কাজ ঢিলে হয়ে গেল—'কী খবর ভাই?'

'আজকাল পাড়ায় খুব রসালো ঘটনা ঘটছে রে, অনু। ওই যে ১০৫ নম্বরের প্রকাশ দামলে—ওর বউ বাচ্চা হতে বাপের বাড়ি গেছে জানিস তো। এই সুযোগে আদিবাসী আয়াটির দফা সেরেছে।'

আমি আঁতকে উঠলুম।

'যা, ময়ূরদি, কী যে বল। ওর বউ কত সুন্দরী। তা ছাড়া দেখলেই মনে হয় ওদের দুজনের ভীষণ প্রেম। আর প্রকাশ দামলে তো ভারি ভদ্র, কারুর দিকে মুখ তুলেই তাকান না।'

ফিক করে হাসল ময়ূরদি।

'এমনিই হয় রে, ভাই। এমন ভীষণ প্রেম কত দেখলাম। পুরুষমানুষগুলো সবই ভণ্ড।'

এজাতীয় কথা শুনলেও আমার ভয় করে, একটুও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। ময়ূরদি বলে,

'তুই একটা বলদ রে, অনু, চোখ খুলে চাইলেই অনেক কিছু দেখতে পাবি।' কিন্তু চোখ খুলতে আমার আগ্রহ নেই। সারাদিন মনে হতে লাগল কামিনী দামলের করুণ মায়াবী মুখখানা। কী সরল আর ভালো প্রকাশ দামালের বউ। কামিনীর বাড়িতে গেলে কেবল বরের প্রশংসা শুনতে হয় বলে সবাই আড়ালে হাসাহাসি করে। একমাস কামিনী বাপের বাড়িতে গেছে। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রকাশ কলকাতায় দৌড়ায় বউকে দেখতে। কোন্ হিংসুক এমন দাম্পত্যের আদর্শে কালি ছেটাল।

ময়ূরদি বলছিল, 'কাল অঞ্জলি তো নিজের চোখেই দেখেছে যে……।'

আমি বাধা দিয়ে বলেছিলুম, 'লোকের কথা আমি একটুও বিশ্বাস করি নে, ময়ূরদি। দেখোগে যাও যারা একথা রটাচ্ছে তারা আমার তোমার বরের নামেও হয়তো কত কী বলে বেড়াচ্ছে।'

এমন সময় জমাদারনি এসে পড়ায় প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ময়ূরদি যেন আমার বুকের মধ্যে একখানা চোরকাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছে।

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলুম—ময়ূরদি আমার সামনেই সূর্যের হাত ধরে টানছে। সূর্য প্রথমে মৃদু আপত্তি জানালেও একটু পরেই দুহাতে ময়ূরদিকে জড়িয়ে কাছে টেনে নিল আর তারপর আমার মুখের ওপর ওরা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ঘুমন্ত আমি বুকের মধ্যে একটা অসহ্য চাপ নিয়ে জেগে উঠলুম। অনুভব করলুম, চোখের জলে বালিশের খানিকটা ভিজে উঠেছে। পূর্ণিমা বোধহয় কাছেই, চাঁদের আলোয় বিছানা থইথই। সেই আলোর বিছানায় সূর্য বুকের কাছে হাত জড়ো করে ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্ত আত্মপ্রত্যয়ে।

সূর্য বড়ো চরিত্রবান স্বামী। তাকে নিয়ে আমার গর্বের শেষ নেই। তবু স্বপ্ন কেন যে এমন অকল্পনীয় ছবি আঁকে। সকালবেলার পরনিন্দা রাত্রিবেলায় আমার সূর্যকে এমন কালিমালিপ্ত করেছে ভেবে খুবই বিরক্ত হলাম নিজের উপর। স্বপ্নেও সূর্যকে চরিত্রহীন মনে করা আমার পক্ষে রীতিমতো পাপ মনে করি। আমি আবার ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু ঘুম এল না। আসলে স্বপ্নটা সূর্যকে বলে ফেলার জন্য মনটা ভয়ানক ছটফট করতে লাগল। সামান্যতম ঘটনাও সূর্যকে না বলা পর্যন্ত আমার শান্তি হয় না। এ আমার এক বদভ্যাস। স্বপ্ন দেখে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে, প্রায়ই আমি সূর্যকেও জাগিয়ে দিয়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলতে বসি। এ জন্য সূর্য কতদিন বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু আমি যে না বলে থাকতে পারি না। অনেক রাতের মতো আজও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে নাক ধরে টেনে দিলুম সূর্যর—

'এই, একটু জাগো না, তোমার নামে একটা ভারি বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখলুম। মন খারাপ।'

'আঃ অনু, কাল সকালে শুনব।' পাশ ফিরে শুল সূর্য। কিন্তু আমি ছাড়লুম না—'এই শোনো না প্লীজ, আজকের স্বপ্নটা সত্যি ইনটারেস্টিং।'

অগত্যা সূর্যকে শুনতে হল। শুনেটুনে হাই তুলে সূর্য বলল, 'শেষ কালে আমার কপালে ওই মুটকিটা…।' তারপর আবার ঘুমে ডুবে গেল ও। ময়ূরদির মুখখানা বেশ ভালো, কিন্তু বড্ড মোটা। সূর্য প্রায়ই ওর চর্বিবহুল শরীর নিয়ে রসালো মন্তব্য করে থাকে। বেচারা ময়ূরদি সেসব শুনলে হয়তো অনশনেই প্রাণটা দেবে।

আজ সকালে রান্নার পরে যথারীতি ময়ূরদি এসে জাঁকিয়ে বসল। ওকে দেখা মাত্র রাতের স্বপ্নটা জিভে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। স্বামীকে জড়িয়ে এমন একটা স্বপ্ন ওকে বলা উচিত হবে না, জানি। কিন্তু কোনো একটা কথা কাউকে বলব না ভাবলে কেবল কেন জানি সেই কথাটাই বলতে ইচ্ছা করে। মা এজন্য আমায় কতবার বকেছেন : 'ভারি বোকা মেয়ে তুই অনু, সব কথা কি বলে ফেলতে হয় নাকি?' কিন্তু অভ্যাস বদলায় নি। আজও দু-তিনবার সামলে নেবার পর হঠাৎ ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল স্বপ্নের গল্পটা। একথা শুনলে নিশ্চিত সূর্য আমাকে বকবে জানি। কিন্তু নিজের বোকামির কথা আবার সূর্যকে না বলা অবধিও তো আমার শান্তি নেই।

ময়ূরাক্ষীর ডায়রি : ২১.৮।৭৩

অনুটা একটা আস্ত ইডিয়ট। বউদি তো অনুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে, 'অনুর মতো সরল আর ভালো মনের মেয়ে খুবই কম হয়।' আহা মরি মরি। সরল! গর্দভ জাতির মতো ভালো প্রাণী তাহলে আর দুনিয়ায় দুটি নেই। কাল অনু নিজের স্বামীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে একটা বেশ রসালো স্বপ্ন দেখেছে। ওমা, আজ সকালেই কিনা সেটা আমাকে বলে বসল। এমন কাণ্ড আবার কোনো মেয়েমানুষ করে নাকি? আচ্ছা, আমাকে যখন বলেছে তখন ওর স্বামীকেও নিশ্চয়ই বলেছে স্বপ্নটার কথা। এরপর যখন সূর্যসারথিবাবুর সাথে দেখা হবে, তখন কি তার একবারও মনে পড়বে না অনুর স্বপ্ন? কে জানে। এমন রূপবান পুরুষের পক্ষে যে এত চরিত্রবান হওয়া সম্ভব তা সূর্যসারথিকে দেখবার আগে পর্যন্ত জানা ছিল না। চার বছর পাশাপাশি থেকে কখনও তার চোখে একটু আগ্রহের আলো জ্বালাতে পারি নি আমি। অনুর মতো একটা বোকাটে টাইপের মেয়ের মধ্যে ও কী পেয়েছে এত, যে এমন বুঁদ হয়ে আছে? কারুর দিকে চোখ তুলেও চায় না? কিন্তু এই স্বপ্নের পর একটিবার তো ইচ্ছে হবে নিশ্চয়ই স্বপ্নের নায়িকার দিকে চোখ তুলে চাইতে?

সূর্যসারথির ডায়রি : ২১.৮।৭৩

অনুকে নিয়ে যে কী করি। ও এত ছেলেমানুষ। কেন যে ময়ূরাক্ষীকে সব কথা বলে বসে। ময়ূরাক্ষীর নাম এই প্রথম আমার ডায়রিতে লিখছি। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে ও। প্রায়ই দেখি অনুর সাথে গল্প করতে। রোগাসোগা অনুর পাশে বিশাল মোটা ময়ূরাক্ষীকে যেন লরেল-হার্ডির মতো দেখায়। অনুর কাছে শুনেটুনে জানি, ময়ূরাক্ষী একটি ট্যাঁপাটোপা পরনিন্দুক মহিলা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনু নাকি স্বপ্ন দেখেছে এহেন মহিলার সাথে তার পরম প্রিয় পতিদেবতা প্রেম করছেন। স্বপ্নটা শুনে মজা পেয়েছিলুম বটে। কিন্তু এ বৃত্তান্ত ময়ূরাক্ষীকে বলা হয়ে গেছে জেনে খুবই বিশ্রী লাগল। মহিলাটি যে হরদম আমাদের বাড়ি এসে থাকেন।

আজ বিকেলে আমরা চা খাচ্ছিলুম, একটা বই হাতে ময়ূর এল। ময়ূর তো রোজই আসে, তবে কেন অকারণে কৈফিয়ত দিল, 'বইটা দিতে এলাম।' অনু ডেকে বলল, 'বোসো ময়ূরদি, চা খেয়ে যাও।' ময়ূর বসল না, কিন্তু চলেও গেল না। ওকে দেখা মাত্রই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। এর সাথে আমি… ভাবামাত্রই একনজর না তাকিয়ে পারা গেল না। দেখলুম খুব পরিপাটি সাজসজ্জা করে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে ময়ূরাক্ষী। ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের শাড়ি তার ফরসা শরীরকে যেন আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। মনে হল, একটু মোটা হলেও মুখখানা বেশ ওর। কিন্তু এত সেজেছে কেন ও? অনু বলল, 'সাজগোজ কিসের? সিনেমা যাবে বুঝি?' ময়ূরাক্ষী বোধহয় 'হ্যাঁ' বলবার জন্যই অরেঞ্জ রঙের ঠোঁট ফাঁক করেছিল, কিন্তু সামনের দেওয়ালে টাঙানো বড়ো ঘড়িটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'নাঃ'। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ইভনিং শো-এর সময় পেরিয়ে গেছে। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থেকে ময়ূরাক্ষী প্রশ্ন করল, 'নতুন "দেশ"টা পড়া হয়ে গেছে নাকি রে, অনু? হয়ে থাকলে দে ভাই।' অনু পাশের ঘরে চলে গেল "দেশ" আনতে। এই কোনায় ডাইনিং টেবিলে চায়ের কাপে চোখ রেখে আমি, আর ওই

কোনায় দরজার ফ্রেমে বাঁধানো ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটি উজ্জ্বল নিষিদ্ধ ছবি। অনুর জন্যই তো ছবিটা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ময়ূরাক্ষীরও কি মনে পড়ছে না এখন স্বপ্নটারই কথা? এ অবস্থায় কোনো মতেই ওর সাথে সহজ হওয়া যায় না। কারুর দিকে তাকানো যাবে না, ভাবলে যেন আরো বেশি করে দেখতে ইচ্ছে হয়। নইলে ময়ূরাক্ষী তো নিতান্ত পুরানো মানুষ, ভবিষ্যতেও কতবার সে আসবে, তবু তাকে আজই কেন ভালো করে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে? চায়ে চুমুক দিয়ে যেতে লাগলাম, কিন্তু তার ফাঁকে একবার অবাধ্য চোখ পলক তুলে ফেলল ছবিটার দিকে। চমকে গেলাম দেখে, উজ্জ্বল বড়ো-বড়ো চোখে একেবারে স্থিরভাবে সে আমারই দিকে চেয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেও দৃষ্টি সরাল না। কী অস্বস্তিকর ব্যাপার। এক চুমুকে বাকি চা শেষ করে আমি উঠে গেলাম।

অনুপূর্বার ডায়রি: ২৩।৮।৭৩

ময়ূরদি খুব খেয়ালি। আজকাল ওর সাজগোজের খেয়াল চেপেছে। প্রায়ই সুন্দর-সুন্দর শাড়ি পরে বেশ সেজেগুজে হাজির হয়। 'কোথায় যাবে আজ, ময়ূরদি?' জিজ্ঞেস করলেই হেঁয়ালি জবাব দেয়, 'জাহান্নমে'। ওকে সাজলে কিন্তু বেশ দেখায়। সূর্য ওকে "মুটকি" নাম দিয়েছে, কিন্তু আমি বলি, 'তোমার চোখ নেই। খালি ওর মোটাটাই দেখ। কেমন চমৎকার মুখখানা। বেচারা। কবে যে ওর বর ফিরবে বিদেশ থেকে।' ভাবি ময়ূরদি এত বছর একলা আছে কেমন করে? সূর্য তো অফিসের কাজে দু দিনের জন্য বাইরে গেলে আমার পাগল-পাগল লাগে। ময়ূরদির কথা ভাবলে ভারি কষ্ট হয়। হে ভগবান, তার স্বামীকে এবার ফিরিয়ে দাও।

ময়ূরাক্ষীর ডায়রি: ২৩।৮।৭৩

ভগবান বলে আমি আর কিছু মানি না। কোন্ অপরাধ করেছিলাম আমি? কেন এভাবে বঞ্চিত হয়ে থাকব সব সুখ থেকে? অনুটা তো একটা বোগাস। ওর কপালে কিনা সূর্যসারথির মতো স্বামী। আমাকে দেখলেই সূর্যসারথি পাশ কাটিয়ে চলে যায় অন্য ঘরে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে অনুর মতো একটা নিতান্ত সাধারণ মেয়ের মধ্যে কী করে এত নিবিষ্ট হয়ে আছে সূর্যসারথি। আমাকে দেখলে একবারও কি স্বপ্নটা স্মরণ করতে ইচ্ছে হয় না ওর? আমি তো যখনই ওকে দেখি স্বপ্নের দেশে চলে যাই। আমার জীবনের কোনো স্বপ্নই কোনোদিন সত্যি হল না।

সূর্যসারথির ডায়রি: ২৮।৮।৭৩

আজ আমার ছুটির দিন। সকালে কাগজ আর রেডিও একসঙ্গে উপভোগ করছিলাম। এমন সময় ময়ূরাক্ষী এসে হাজির। অনুর স্বপ্নের ব্যাপারটা বেশ অসুবিধায় ফেলে দিয়েছে আমাকে। ময়ূরাক্ষীর দিকে চাইলেই মনে হয় ও যেন সেই স্বপ্নটার কথাই ভাবছে আর আমাকেও মনে করিয়ে দিতে চাইছে। এই সাত-সকালেই কী সুন্দর ফিটফাট ময়ূরাক্ষী। স্নানসারা শরীরের স্নিগ্ধতা চারিদিকে ছড়িয়ে, এলোচুলে পিঠ ঢেকে ময়ূরাক্ষী কেন যে বসার ঘরে এসে দাঁড়াল কে জানে। ও তো জানে অনু এ সময় রান্নাঘরে থাকে। ভিতর থেকে আওয়াজও আসছিল রান্নার, তবু ময়ূরাক্ষী আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'অনু কোথায়?' খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ময়ূর। প্রশ্নটা করে ফেলেই ভুল শুধরে নিল, 'অনু যে রান্নাঘরে ঢুকতে পারছি আওয়াজেই। আসলে আমি ভাবছিলাম অনুর বুঝি রান্না হয়ে গেছে, দুজনে একটু আড্ডা মারব।' আমি অগত্যা বললাম, 'বসুন, অনুর এখুনি হয়ে যাবে।' রান্নাঘরে ডাকতে গেলাম অনুকে। কিন্তু

অনু আমাকে রেহাই দিল না। বলল, 'তুমি একটু গল্প করো না ময়ূরদির সাথে, আমি এলাম বলে। রান্না শেষ।' অনুর সর্বাঙ্গ ঘামে জবজবে। মাথার চুল এলোমেলো, শাড়ির নীচ দিয়ে আধ হাত সায়া বেরিয়ে আছে। আমি বললাম, 'একটু পরিষ্কার হয়ে এসো।' হেসে গড়িয়ে পড়ল অনু, 'তোমার যেমন কথা। ময়ূরদি তো অষ্টপ্রহর আসছে আর আমাকে এই সাজেই দেখছে, ওর সামনে আবার সাজ কী?' অনু বড়ো সরল। ও বোঝে না, সাজগোজ ময়ূরদির জন্য নয়, আমার জন্যই প্রয়োজন।

আমি বসার ঘরে এসে ময়ূরের মুখোমুখি বসে গল্প চালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দেখলাম চমৎকার কথা বলতে পারে ময়ূর। চেহারায়, কথায়-বার্তায় বুদ্ধির ধার ঝকঝক করছে। এই চালাক চতুর ভাবটা অনুর ব্যবহারে একেবারেই অনুভব হয় না। ময়ূরের তুলনায় অনুর ব্যক্তিত্ব যেন অনেকটাই ভোঁতা।

অনুপূর্বার ডায়রি: ৩১।৮।৭৩

সূর্যকে সব সময়ই ভালো লাগে; কিন্তু আজকাল যেন আরও বেশি ভালো লাগছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে আদরে অতিষ্ঠ করে তোলে। এক মুহূর্ত কাছ-ছাড়া করতে চায় না আমাকে। রাত্রিবেলায় কাল সূর্য আমাকে বলল, 'তুমি আমার কাছে থাকো, তুমি দূরে গেলে আমার ভয় করে, পাছে তুমি হারিয়ে যাও।' সূর্যর বুকে মাথা রেখে বলি, 'আমি তো তোমার কাছেই আছি।' আমায় সজোরে চেপে ধরে সূর্য বলে, 'আরও কাছে থাকো অনু, আরও কাছে।' সুখে আমার প্রাণ ভরে ওঠে। স্বামীর এমন ভালোবাসা কজন মেয়েই বা পায়? এই স্বামীকে নিয়ে স্বপ্নেও কী করে যে কুদৃশ্য দেখলুম, ভাবলে লজ্জায় মরে যাই। ঈশ্বরের কাছে নিত্য প্রার্থনা করি, আমি যেন সূর্যর যোগ্য স্ত্রী হয়ে উঠতে পারি। রূপে গুণে সূর্য যে আশ্চর্য মানুষ, আমি তো তার পাশে কিছুই নয়। সূর্যকে পেয়ে আমি ধন্য। জন্মজন্মান্তরে যেন এমনই স্বামী পাই।

ময়ূরাক্ষীর ডায়রি: ২।৯।৭৩

ধ্যুৎ, এভাবে আর ভালো লাগে না। আর কার অপেক্ষায় জীবন কাটাচ্ছি আমি? নীলাঞ্জন কি কোনোদিন ফিরবে নাকি দেশে? দেখতে-দেখতে আট বছর পেরিয়ে গেল। বিয়ের সময় বয়স ছিল কুড়ি, এখন আটাশ। বুড়ি হয়ে যাচ্ছি। জীবনটাকে আর উপভোগ করব কবে? নীলাঞ্জনটা একটা পয়লা নম্বরের লম্পট। দাদারা বিয়ের আগে খোঁজ নেয় নি ভালো করে। আশ্চর্য, এই আট বছর পরেও দাদা-বউদি ভাবে নীলাঞ্জন দেশে ফিরবে। কচু ফিরবে। লোকের মুখে ডরোথি-বৃত্তান্ত আমি জেনে গেছি আর দাদারা কি কিছুই শোনে নি? আমি জানি সব শুনেও দাদা চোখকান বুজে থাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার কী হবে? আমি কি এমনি করে সিঁদুরের ছদ্মবেশের আড়ালে দাদা-বউদির সংসারে উপবাসেই শেষ হয়ে যাব? কিছুতেই না, কিছুতেই না। এভাবে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি···আমি···

সূর্যসারথির ডায়রি: ৪।৯।৭৩

কিছু দিন ধরে দেখছি ময়ূরাক্ষীর এ বাড়িতে আসা যেন তিনগুণ বেড়ে গেছে। এত বেশি ওর না আসাই ভালো। কিন্তু ও এলে বেশ লাগে। না এলে বাড়ির আবহাওয়া যেন ক্লান্তিকর মনে হয়। এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়।

অনুপূর্বার ডায়রি: ৫।৯।৭৩

ছুটির দিনটাও সারাটা সময় ময়ূরদি এখানেই কাটাল। সূর্যকে একটুও বেশি কাছে পাওয়া গেল না। নাঃ,

আমি বড় স্বার্থপর। ময়ূরদি কত একা, কত দুঃখী। কোথায় আমি ওকে সঙ্গ দেব তা নয়, কেবল নিজের স্বার্থ ভাবি।

ময়ূরাক্ষীর ডায়রি : ৫।৯।৭৩

আজ খুব আড্ডা জমেছিল সূর্যসারথিবাবুর সঙ্গে। আজ ওনার অফ ডে থাকাতে প্রায় সারাদিনই গল্প করা গেছে। ভারি ভালো লাগছে, ভারি ভালো।

সূর্যসারথির ডায়রি : ৯।৯।৭৩

ময়ূরাক্ষী বড়ো চালাক মেয়ে। আমার অসহায় দুর্বলতাকে ও ঠিক বুঝে নিয়েছে। আমি যেটুকু সময় বাড়িতে থাকি, ও যেন ঠিক সেই সময়টাতেই নানা ছুতোয় এসে বসে থাকে। আমারও মনে-মনে ওর জন্য যে অপেক্ষা অধীর হয়ে উঠছে ক্রমশ, তা ঠিক ও জেনে যায়। চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে। চার বছরের বিবাহিত জীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও অনুর চোখে আমি কখনও এমন মোহিনী দৃষ্টি দেখি নি।

আজ সন্ধ্যায় আমরা তিনজনে গল্প করছিলাম দক্ষিণের ব্যালকনিতে। এমন সময় টেলিফোনে ডাক এল কারখানা থেকে। তখুনি কারখানায় যাওয়া দরকার। তবু অযথা দেরি করতে লাগলাম। কাজের ক্ষতি হবে জেনেও বসে রইলাম ময়ূরের সামনে। কিন্তু এ আমি কী করছি? অনু যদি আমার মনের গতি বুঝতে পারে? আমি জানি অনু বুঝবে না কিছুই। ময়ূরের মতো ওর অত বুদ্ধিই নেই। কিন্তু আমি যে অনুকে ঠকাতে চাই না। অনু এত ভালো মানুষ, ওর ভাগ্যে এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটা উচিত নয়। কোনোদিন জানতে পারলে এত বড়ো আঘাত অনু কখনোই সইতে পারবে না। ময়ূরের আর এ বাড়িতে না আসাই ভালো। ঈশ্বর আমাকে শক্তি দাও, অনুকে আমি যেন না ঠকাই।

ময়ূরাক্ষীর ডায়রি : ১৫।৯।৭৩

ঈশ্বর কি তাহলে আছেন? কে জানত একটা স্বপ্নের বিবৃতি এমন করে আমার ভাগ্য খুলে দেবে। নাই বা পেলাম পুরোপুরি, কিন্তু একটুর জন্যও সূর্যর মতো মানুষকে কাছে পাওয়া আমার পক্ষে কম নয়। আমার দিনরাত্রিগুলোর স্বাদগন্ধ সব যেন বদলে গেছে। অনুর সর্বনাশ করছি জানি। কিন্তু তাতে কী? ডরোথি কি বিনা কারণে আমার সর্বনাশ করে নি? কী পাপ করেছিলাম আমি যে আমার স্বামীকে কেড়ে নেওয়া হল আমার কাছ থেকে? আট বছরের অবহেলা, অপমান আর তৃষ্ণা কি আমাকে জানোয়ার করেছে? থাক, সে বিচারে আমার মনকে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত করতে চাই না। আমার এতদিনকার নিঃস্ব জীবনে আজ যখন সুযোগ এসেছে, তাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। কিছুতেই না।

অনুপূর্বার ডায়রি : ২০।৯।৭৩

কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে। সূর্যর মধ্যে কী যেন একটা পরিবর্তন এসেছে, সেটা সে আমার কাছ থেকে সযত্নে গোপন করতে চায়। ময়ূরদি তো বরাবরই আমাদের বাড়িতে আসে। আজ কাল ও এলেই কেন যে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হা ভগবান, এসব কী পাপ চিন্তা মনে আনছি। আমার যেন নরকেও ঠাঁই না হয়।

সূর্যসারথির ডায়রি : ৩০।৯।৭৩

এ কোথায় নেমে চললাম? আমি যে আর আমার বশে নেই। ময়ূর যেন একটা অজগরের মতো আমাকে সম্মোহিত করে ধীরে-ধীরে গহ্বরে টেনে নিচ্ছে। অনুর কথা ভাবলে ভেতরটা শুকিয়ে ওঠে। কাল রাতে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, অনু একমুঠো স্লীপিং

পিল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কত ডাকছি কিন্তু অনু কিছুতেই জাগছে না। স্বপ্নের মধ্যে অনুর নাম ধরে চিৎকার করে উঠে বসলাম। অনুও জেগে গিয়েছিল, আমায় জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'উঃ, কী বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখলাম, অনু।' ওকে বললাম স্বপ্নটা। শুনে অনু ম্লান হেসে শুধু বলল, 'আজকাল তুমিও স্বপ্ন দেখছ?' তারপর আমার বুকের কাছে পোষা প্রাণীটির মতো গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার কিন্তু ঘুম এল না কিছুতে। অপরাধীর মতো চেয়ে রইলাম ওর নিষ্পাপ মুখের দিকে। আমি জানি বাস্তবে তেমন কোনো অঘটনের ভয় নেই। অনু অত্যন্ত শিশু, সরল এবং আমাকে যথার্থই ভালোবাসে। তার পক্ষে এসব বাঁকা ব্যাপার কল্পনা করা যেমনি কঠিন, তেমনি কঠিন আমাকে ছেড়ে যাবার চিন্তা। আর আমাকে সন্দেহ করার মতো পাপ তার কাছে বোধহয় অন্য কিছু নেই। কিন্তু তবু নিজের অপরাধ একটা ভয়ের দলা হয়ে আমার গলায় আটকে থাকে, ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরে।

ময়ূরাক্ষীর ডায়রি : ২।১০।৭৩

আহা, দিনগুলো যেন পরীদের পাখা হয়ে গেছে। কী যে ভালো লাগা! সূর্যের কেবল অকারণ ভয়। আরে এত ভয় কিসের? অনুটা তো এক নম্বরের ক্যাবলা। ওর কি সত্যি কোনো চোখ আছে নাকি?

অনুপূর্বার ডায়রি : ৮।১০।৭৩

হা ভগবান! এই কি শেষে কপালে লেখা ছিল? কিছুদিন ধরে যে সন্দেহটা কেবলই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, সেটা তবে মিথ্যে নয়!

আজ বিকেলে গানের ক্লাস ছিল। ময়ূরদিও আমার সাথে গান শিখতে যায়। আজ আমার সাথে গেল না। বলল বাড়িতে কাজ আছে। আমি একাই চলে গেলুম। কিন্তু গানে কিছুতে মন বসল না। আজকাল কোনো কিছুতেই মন লাগাতে পারি না। ক্লাসে বসে কেবলই মনে হতে লাগল সূর্য হয়তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে আর ময়ূরদি···। জোর করে কিছুক্ষণ বসে থাকবার চেষ্টা করে অবশেষে শরীর খারাপের অজুহাতে ছুটি নিয়ে নিলুম। রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলুম। সূর্য তো বলেই গেছে কাজ আছে আজ, ফিরতে অনেকটা দেরি হবে। আমি কী করে এত অবিশ্বাস করতে পারছি সূর্যকে?

বাস স্ট্যানডে এসে দেখলাম কী এক কারণে বাস বন্ধ। গানের ক্লাস থেকে আমাদের বাড়ি মাইল খানেক রাস্তা। হেঁটেই চলে যাব মনে করে পার্কের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরলাম। কিন্তু কিছু দূর আসতেই এ কী দেখলাম? সেদিনের স্বপ্নটা আজ দিব্যি সত্যি হয়ে গেছে! লেকের ধারে গোল ঝাউয়ের নিভৃত কোনায় ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে ময়ূরদি আর···।

এখন আমি কী করব? আমার কী করা উচিত? পাগলের মতো বিশৃঙ্খলভাবে কিছু ভেবে চলেছি। কী ভাবছি নিজেই জানি না।

সূর্য তার কথা রেখেছে। অনেক রাত করেই বাড়ি ফিরেছে। তার মানসিক অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমার অস্থিরতা কিংবা কান্নায় ফোলা লাল চোখ তার নজরেই পড়ল না। এসেই শুয়ে পড়ল, বলল খেয়ে এসেছে। সেদিন রাতে সে স্বপ্ন দেখেছিল আমার চোখে চিরকালের ঘুম। এমন স্বপ্ন দেখল কেন সূর্য? সে কি অবচেতনে আমার মৃত্যু কামনা করে? উঃ, ঠাকুর, তবে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ কেন?

ইদানীং আমার ঘুমোতে ভয় করত। প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম অনুকে হারিয়েছি। আজ বিকেলে অফিস থেকে ফিরে দেখলাম অনু ঘুমিয়ে আছে। এমন অসময়ে অনু ঘুমোয় না, তবে কাল সারারাত ও ঘুমোয় নি। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে স্পষ্ট টের পেয়েছিলাম ওর জেগে থাকা, কিন্তু তবু কথা বলতে পারি নি। শরীর নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে আজ। ঘুমোক। আমি স্নানটান সেরে ফেললাম, কিন্তু তখনও অনু জাগল না। ধাক্কা দেবার জন্য গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলাম, আমি কি তবে এখন ঘুমিয়ে আছি, নইলে স্বপ্নটা কেন আবার···

কিছুক্ষণ আগে শ্মশান থেকে ফিরেছি। এখন রাত দুটো। মনে হচ্ছে যেন একটা এমন দুঃস্বপ্ন দেখে চলেছি যা থেকে আর কোনোদিনই জেগে ওঠা যাবে না।

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা

ড. অরুণা হালদারের "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা—হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতি" প্রবন্ধের শেষাংশ ছাপা হবে আগামী অকটোবর ১৯৯১ সংখ্যায়। অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় ছাপা সম্ভব হল না বলে আমরা দুঃখিত।

গ্রেহম গ্রীন ও কথাশিল্প

সুপ্রিয়া চৌধুরী

আধুনিক সমালোচনার যুগে, জনপ্রিয়তা মহাপাপ। যাঁরা জনপ্রিয় সাহিত্যের সমালোচনা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে পিয়ের মাসেরের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য :

> The critic, employing a new language, brings out a *difference* with the work by demonstrating that it is *other than it is*.[১]

প্রভেদ-পরিচায়ক এই সমালোচনা কিন্তু গ্রেহম গ্রীনের উপন্যাস নিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। ফলত, যে গুণগুলি গ্রেহম গ্রীনের রচনাকে সহজে উপভোগ্য করে তোলে, সেগুলিই আবার এই রচনার সাহিত্যিক মূল্যায়নের বিঘ্ন ঘটায়। অথচ একটি কথা অনস্বীকার্য : তাঁর লেখা এই ভিতেই দাঁড়িয়ে। রহস্যের স্বাদ, রোমাঞ্চের শিহরন, মানুষের সর্বগ্রাহী কৌতূহল যে আখ্যানপদ্ধতির জন্ম দেয়, সেটিকেই আশ্চর্যভাবে নিজের করে নিয়েছেন তিনি। যিনি উনিশ বছর বয়সে নিজের কপালে রিভলভার ধরে জীবনমরণের মারাত্মক খেলা খেলেছিলেন, তাঁর কাছে সাহিত্যসৃষ্টি নিশ্চয়ই একটি তাৎপর্যপূর্ণ খেলা, প্রমোদন।

গোড়ার দিকের অনেকগুলি উপন্যাসকে গ্রীন "প্রমোদন" (entertainment) নাম দিয়েছিলেন। এমনকী "ব্রাইটন রক"-এর প্রথম পঞ্চাশ পৃষ্ঠাও সোজাসুজি গোয়েন্দাকাহিনীর ঢঙে লেখা। পরে গ্রীন বলেছিলেন যে পারলে তিনি ওই অংশটুকু বাদ দিয়ে উপন্যাসটি ফিরে লিখতেন। এই অবজ্ঞা লেখকের, পাঠকের নয় : এই পঞ্চাশ পৃষ্ঠা আমার স্মৃতিতে যতটা স্পষ্ট, বাকি উপন্যাসের আর কিছুই বোধহয় তেমন নয়। কাহিনীর গতি, সংযুক্তি, বাস্তবিকতা ও প্রকল্পনা (fantasy)-র যেখানে উৎস, চাইলেই কি তাকে বাদ দেওয়া যায়? গ্রীনও পারেন নি। মমত্বহীন সমাজবিচ্ছিন্ন গুণ্ডা পিঙ্কির এই তো প্রকৃত জন্মভূমি : বিশেষ কোনো স্থানে নয়, বিশেষ এক ধরনের রচনায়।

সুপ্রিয়া চৌধুরী পড়াশুনা করেছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর শিক্ষকতা-জীবনে দশ বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবার পর তিনি গত ছয় বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনারত।

কাহিনীর অন্য দিকও আছে। "প্রমোদন"-শ্রেণী-ভুক্ত একটি উপন্যাস, "দ্য মিনিস্ট্রি অব ফিয়ার" বহু-দিন বাদে আবার পড়লাম। তার মুখ্য চরিত্র রো নিজের অসুস্থ ও যন্ত্রণাপীড়িত স্ত্রীকে দয়াবশত খুন করে এবং সেই অপরাধের দায়ে জেল খাটে। মুক্তির পর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত ইংল্যানডে সে অদ্ভুত এক রহস্যে জড়িয়ে পড়ে। সেই রহস্যের নায়ক, উদ্বাস্তু অস্ট্রীয় গুপ্তচর হিলফেকে উপন্যাসের শেষদিকে একটি অর্থপূর্ণ মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই। হিলফে একখানা কবিতার বই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে —যেন নিষ্পাপ ঘুমন্ত শিশু, যার খেলাশেষের নিদ্রায় বিশ্বেরও শান্তি। বইয়ের বা কবির নাম অবশ্য গ্রীন বলেন নি : কিন্তু হিলফে যে কবিতা পড়ছিল তার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, স্মৃতিস্তম্ভের ফলকের মতো। শিক্ষিত পাঠক পংক্তিগুলি চিনতে পারবেন : রিলকের 'অর্ফেয়ুসের প্রতি সনেট-গুচ্ছ'-এর পঞ্চম সনেটের অংশ :

Denn Orpheus ists. Seine Metamorphose
in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühn

um andre Namen. Ein für alle Male
ists Orpheus, wenn es singt.

(Rilke, *Sonnette an Orpheus*, I.V.)

(ভাবানুবাদ)

এই তো অর্ফেয়ুস : তার রূপ-পরিবর্তন
এটাতে, মেটাতে। অপর কোন নাম

আমরা ভাবি না যেন। এই শেষ কথা
যখনই গান হয়, তখনই অর্ফেয়ুস উপস্থিত॥

মানুষের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচকের দুর্বলতাও যেন গ্রীন ঠিক ধরে ফেলেছেন : এই খেলার মধ্যে তাকেও দিয়েছেন একটি খেলনা। কারণ অর্ফেয়ুসকে আমরা চিনি, এবং অনুরূপতা ভালো-বাসি। গ্রীক তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই আদিকবি তাঁর স্ত্রী এউরিডিকেকে মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনতে গান করে, বীণা বাজিয়ে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন, যমরাজের হাত থেকে এউরিডিকেকে ফিরেও পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্নেহদুর্বল দৃষ্টি শেষ মুহূর্তে পিছনপানে তাকায়, এবং এউরিডিকে অন্ধকার ছায়ারাজ্যে মিলিয়ে যান। রিলকের অর্ফেয়ুস কবি; তিনি 'আসেন ও যান···সীমা অতিক্রম করেন'; ইহলোক পরলোক, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যস্থতা করেন ('Er kommt und geht···er überschrei-tet')।

এই কথাগুলো যখন সমালোচকের মনে পড়ে, তখন রোয়ের কাহিনীর স্বরূপ পরিবর্তন হয়। রো-ই কি সেই অর্ফেয়ুস, যে অন্ধকার ছায়ারাজ্যে স্ত্রীকে পাঠিয়েছিল। আবার নানা বিপদের মধ্যে তাকে খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেরে— স্ত্রীকে নিয়ে নয়, কিন্তু তারই একটি ছায়াকে আঁকড়ে, যাকে সে ভালোবাসে : হিলফের বোন, অ্যানা? অর্ফেয়ুস স্ত্রীকে পান নি—এমনকী তাঁর ছায়াকেও নয়। তিনি সভ্যজগৎ ছেড়ে অরণ্যবাসী হয়েছিলেন, বনের বৃক্ষ এবং পশুরা আসত তাঁর বীণাবাদন শুনতে। কিন্তু গ্রীনের উপন্যাস যেহেতু প্রমোদনধর্মী, এবং রো যেহেতু অর্ফেয়ুস নয়, সে মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, অনুতাপ, সঞ্চিত অপরাধবোধের মধ্যেও বেঁচে থাকবে পত্নীরূপিণী আরেক প্রেমিকাকে নিয়ে।

সংকেতবহুল এই মুহূর্তগুলি কিন্তু গ্রীনের রচনায় বিরল। এও মনে হয়, রোয়ের কাহিনী কি এই পৌরাণিক উপমার ভার বহন করতে পারে? গল্পটির আপাত-আকর্ষণ অন্যত্র : metonymic অর্থাৎ লক্ষণা-ভিত্তিক রচনায় সযত্নে প্রতিচিত্রিত বাস্তবকে কিভাবে আখ্যানের গতি ও সংযুক্তি ভয়াবহ অবাস্তব করে তোলে, তার পরিচয়ে। এই বিবর্তনের ফলে বাস্তবের প্রতি আমাদের যেমন সন্দেহ জাগে, তেমনই আখ্যানটি আমাদের কাছে দীর্ঘায়িত উপমা বা রূপক বলে মনে হয়। ১৯৪২ সালে বইটি লেখার সময় গ্রীন আফ্রিকায় ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কাজে নিযুক্ত

ছিলেন; ফ্রিটাউনের ভগ্নপ্রায় একটি বাড়িতে তাঁর দপ্তর, কাজ সংকেতলিপিতে তারবার্তা পাঠানো। দুপুরে বাড়ির লোহার ছাদে শকুনের তাণ্ডব; সন্ধ্যা হতেই শুরু হত ইঁদুর আর আরশোলার উপদ্রব। গ্রীনের পরের উপন্যাস, "দ্য হার্ট অব দ্য ম্যাটার" এই পরিবেশের মধ্যেই অবস্থিত। এ সময়কার দিনলিপি বা পরে লেখা আত্মকথা পড়লে বোঝা যায়— ঔদাসীন্য, নিঃসঙ্গতা, নৈরাশ্যের সঙ্গে তখন কিভাবে জড়িয়ে ছিল পশ্চিম আফ্রিকার প্রতি লেখকের গভীর অনুরাগ। "দ্য মিনিস্ট্রি অব ফিয়ার"-এ ফেলে আসা ব্রিটেনের স্মৃতির প্রকাল্পনিক (fantastic) রূপায়ণের গূঢ়পাঠ (subtext) হয়তো লেখকের এই প্রবাস-অবস্থা। বইটি "প্রমোদন"[২] : মোটা দাগের এমন অনেক কিছুই এতে আছে যা গ্রীনের পরবর্তী সাহিত্য-জীবনে অস্বস্তির কারণ হতে থাকবে। রূপক-জাতীয় অলংকার তিনি ক্রমশ বর্জন করেছেন। তবু শেষ পর্যন্ত গ্রীনের লেখা এই প্রবল দোটানার মধ্যে দাঁড়িয়ে : একদিকে নিতান্ত সেকেলে, বাস্তবধর্মী আখ্যানপদ্ধতি —অন্যদিকে নাস্তিক বা সন্দেহপ্রবণ, আধিবিদ্যক চিন্তা। গ্রীনের পূর্বসূরী কনর‍্যাডের লেখাতেও এই দ্বিত্ব দেখতে পাই।

রিলকের কবিতার পংক্তি মুহূর্তের মধ্যে রোয়ের কাহিনীকে যেভাবে মুক্তপাঠ (open text) করে তোলে, তা হয়তো সহজসাধ্য। গ্রীনের পরের দিকের রচনা আরো সংযত। অত চট করে আর ওঁর রচনা-পদ্ধতি ধরে ফেলা যায় না। বিষয়বস্তুগুলি এক থেকে যায়—অচেনা পরিস্থিতিতে আত্মগ্লানি, অপরাধ, ভয়, লজ্জা -পীড়িত মানুষের পরিচয়। ব্রাউনিঙের যে বাক্যাংশটি বহুবার গ্রীনের লেখা-প্রসঙ্গে উদ্‌ধৃত করা হয়েছে ('the dangerous edge of things')[৩], সেটি মনে রাখলে বোঝা যায় যে উপন্যাসের গতি, ঘটনাবলির দ্রুত পরিবর্তন, থ্রিলার-ধর্মী আখ্যানের রৈখিক বিন্যাস সত্ত্বেও, এক পক্ষে গ্রীন ব্রাউনিঙের মতোই তাঁর চরিত্রগুলিকে কল্পনা করে নিচ্ছেন বিশেষ একটা সঙ্কটের মুহূর্তে—এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন তার স্বরূপ সমস্যায়িত (problematized) হয়ে ওঠে।

চরিত্রগুলি নিঃসঙ্গও বটে। সামাজিক সম্পর্ক বা আদান-প্রদান বলতে গেলে গ্রীনের উপন্যাসে নেই-ই। মুখ্য চরিত্রের যে একাকিত্ব, তা যেন উপন্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে সমাজকেও করে ফেলে একাকী কয়েকটি ব্যক্তির সমষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীতে যে অর্থে "সমাজ" কথাটি ব্যবহার করা যেত, তা আধুনিক যুগে হয়তো খাটে না। সেই সমাজকে গ্রীন ভয় করেন, এড়াতে চান। কিন্তু উপন্যাসেরও একটি সমাজ আছে; চরিত্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক সেখানেই। কনর‍্যাড তাঁর উপন্যাস "দ্য সিক্রেট এজেনট"-এ যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তৎকালীন লনডন শহরকে দেখেছেন, গ্রীন সেই চোখেই হয়তো সভ্য-অসভ্য জগৎকে সমগ্রভাবে দেখেন। কিন্তু কনর‍্যাডের "নস্ট্রোমো"-র মতো উপন্যাস গ্রীন লিখতে পারতেন না। উপন্যাসের নান্দনিক জগতে যে স্থায়িত্ব আসতে পারে, তাও তিনি অস্বীকার করেন। অথচ ছোটো বড়ো ব্যক্তিসমষ্টি তাঁর উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে মনে পড়ে "এ বার্নট্‌-আউট কেস"-এর কুষ্ঠচিকিৎসালয়ের কর্মিবৃন্দের কথা। নায়কের একাকিত্ব মানেই আত্মসর্বস্বতা বা solipsism নয়। কিন্তু "এ বার্নট্‌-আউট কেস"-এর নায়ক কোয়েরি এবং "দ্য হার্ট অব দ্য ম্যাটার"-এর নায়ক স্কোবির এখানে মিল : অন্তিমে দুজনের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা ঔদাসীন্য। কোয়েরির রোগই এই ঔদাসীন্য : স্কোবির দুর্বলতা বরং দয়া বা মমতা। চরিত্র দুটি পরস্পরবিরোধী। তবু কেন মনে হয় যে এক ভয়ানক অহংকার দুজনকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করাচ্ছে?

গ্রীনের চরিত্রগুলি অতিপরিচিত আধুনিক রোগে অসুস্থ। উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে (dialectic-এ) এই রোগের বিপক্ষস্থান অধিকার করে আছে কেবল ধর্ম : ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভগবৎপ্রেম, আত্মবিস্মৃতি—যে

নামই দিই। এমনকী শেষের দিকের উপন্যাস "মনসিন্যোর কুইক্সোট"-এর নায়ক, নিষ্পাপ ধর্ম-পরায়ণ পাদ্রিরও ভয় হয় যে পাপের প্রলোভন ভোগ না করাও হয়তো এক ধরনের ঔদাসীন্য, যা ঈশ্বরকে দূরে রাখে। ঈশ্বর আছেন কি নেই, তিনিও নিশ্চিত জানেন না। গ্রীনের কথার বয়ান (discourse) মেনে নিয়ে যদি আমরা এই বিতর্কে প্রবেশ করি, মনে হবে উপন্যাসে এর বাইরে কিছু নেই।

কাহিনীর রচনাপদ্ধতি কিন্তু আরেক রকম বোঝায়। বার্থ যাকে বলেন L' effet de re'el[৪] (বাস্তব-ভাব) তা কেবলই এই বিতর্কের ধারা-বাহিকতা ভেঙে দেয়, তাকে ছিন্ন বা বিভক্ত করে। গ্রীনের উপন্যাসে বাস্তবব্যয়িত পরিবেশের সংকেতচিহ্ন ভুলে থাকা যায় না। এই সংকেতগুলো আধিবিদ্যক নয়, কিন্তু বার্তাবহ বটে। তিনশ বছরেরও বেশি আগেকার আপাতসহজ সমালোচনার ভাষায় ডক্টর জন্‌সন একটি কঠিন উক্তি করেছিলেন :

> Imitations give pain or pleasure, not because they are mistaken for realities, but because they bring realities to mind.[৫]

কাহিনীর বহির্ভূত বাস্তব কী? এই প্রশ্নের জবাব যদি নাও দিতে চাই, তবু বাস্তবের বার্তাবাহক হয়ে থাকবে উপন্যাসের এই বর্ণিত পরিবেশ। কাহিনীর চরিত্রগুলি তার চাপ অস্বীকার করতে পারে না। এবং এই পরাভব কিন্তু শেষ পর্যন্ত রচনাপ্রক্রিয়ার দ্বারাই সম্পন্ন। এই যে বাস্তব, যা কথা দিয়ে গঠিত, তা গ্রীনের আত্মকথা, ভ্রমণকাহিনী বা প্রবন্ধকে সমান-ভাবে 'পাঠ্য' (textual) করে তোলে।

গ্রীনের উপন্যাসের আকার ভৌগোলিক মান-চিত্রের মতো। এক-একজন লেখকের কল্পনাশক্তি চালনা করে ইতিহাস; গ্রীনের কল্পনা ভৌগোলিক। গ্রীন লিখেছেন, কল্পনার একটি নিজস্ব ভূগোল আছে, যা সময়ের সঙ্গে পালটায় :

> The imagintion has its own geography, which alters with the centuries. Each continent in turn looms up on the horizon like a great rock carved with unintelligible hieroglyphics and symbols catching at the unconscious.[৬]

ক্ষুধার্ত কল্পনা এই প্রস্তরখণ্ডগুলিকে গ্রাস করে সেগুলির উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। গ্রীন কথা-গুলি লিখেছেন উনবিংশ শতাব্দীর আফ্রিকা-আবিষ্কারার্থে ইয়োরোপীয় ভ্রমণ প্রসঙ্গে। নিজে যখন তিনি দ্বিতীয়বার আফ্রিকা যাত্রা করলেন, দিনলিপিতে কনর‍্যাডের "হার্ট অব ডার্কনেস" মনে রেখে লিখে-ছিলেন :

> It felt odd and poetic and encouraging coming back again after so many years, a shape imposing itself on life after chaos... Africa will always be the Africa of the Victorian atlas, the blank unexplored continent the shape of the human heart.[৭]

কনর‍্যাড বা গ্রীন, কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি আফ্রিকাকে কল্পনাজগতের উপনিবেশ করে নেওয়া। বরং মানচিত্রটাই তাঁদের গ্রাস করেছে, যেমন গ্রাস করেছিল প্রথম যুগের শত-শত ইয়োরোপীয় ভ্রমণ-কারীকে। এই আত্মবিসর্জনকে গ্রীন তুলনা করেছেন লেখকের চরিত্রের কাছে আত্মসমর্পণের সঙ্গে।

> Is it that the explorer has the same creative sickness as the writer or the artist, and that to fill in the map, as to fill in the character or features of a human being, requires the same urge to surrender and self-destruction ? – you cannot even surrender yourself so completely to a book or a picture as you can to the chances of death.[৮]

মৃত্যু কামনা করা এবং লেখক হওয়া গ্রীনের ক্ষেত্রে একই ক্রমাগ্রসরণের পর-পর ধাপ। একত্রিশ বছর বয়সে যখন তিনি প্রথম পশ্চিম আফ্রিকায় যান, ভ্রমণকাহিনী রচনা ("জার্নি উইথাউট ম্যাপস্") ও আত্মহত্যা করার মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু বাঁচার সাধও যুগিয়েছিল সেই যাত্রা : জীবনকে বাস্তবিক অর্থে অক্লান্ত ভ্রমণের রূপ দিয়েছিল। মেক্সিকো, মালয়েশিয়া, কেনিয়া, ভিয়েৎনাম, পোল্যানড, বেলজিয়াম, কঙ্গো, দক্ষিণ আমেরিকা, কিউবা, স্পেন : সাংবাদিক জীবনে এবং তার পরেও গ্রীনের এই ভৌগোলিক অন্বেষণ সমান গতিতে চলেছে। নিজেকে খুঁজছিলেন তিনি, নাকি—যে কথা লিখেছেন—নিজের কাছ থেকে পালাচ্ছিলেন ?

কনর‍্যাডীয় রচনা যেখানে গ্রীনকে এতটাই প্রভাবিত করেছে। আমরা গ্রীনের সর্বাধিক "কন-র‍্যাডীয়" উপন্যাসটি দৃষ্টান্ত হিসাবে নিতে পারি। "এ বার্নট-আউট কেস"-এর নায়ক কোয়েরির যাত্রার কোনো ব্যক্ত উদ্দেশ্য নেই। জাহাজের নির্দিষ্ট যাত্রাপথের শেষে সে তীরে এসে নামে। তার অসাড়তা মানচিত্রের ফাঁকা জায়গার মতো—অন্যেরা সেটাকে অর্থ দিয়ে পুরণ করতে চায়। এই অর্থদানই উপন্যাসের ধর্ম—গোপনে গ্রীনও কি এ ব্যাপারে সচেষ্ট নন ? তার নায়কের নামের ধ্বনি আমাদের মনে জাগায় প্রশ্ন (query); আবার মাছিটিকে করে ফেলে আমাদের এই কৌতূহলের উদ্দিষ্ট শিকার (quarry)। কোয়েরির অরণ্যবাসে তার ব্যক্তিসত্তা নিয়ে টানাটানি করে তার পার্শ্ববর্তী চরিত্রগুলি; তার মধ্যে দেখে নিজেদের ক্ষুধা, লোভ, নিঃসঙ্গতার পরিপূরক; তাদের চরিত্রণ পুষ্ট হয় কোয়েরির আত্মাপসরণে। নিজের সম্বন্ধে কৌতূহল কোয়েরির নেই। কনর‍্যাডের কুর্টসের এই আধুনিকতর সংস্করণকে খুঁজতে আসে স্থূলবুদ্ধি সাংবাদিক পাকিনস, দরদি চিন্তাশীল মার্লো নয়। তাই কুর্টসের অন্তরস্পর্শী আর্তনাদ, যার মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতা আপনার ভয়ংকর নিঃস্বতার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিল, যা কোয়েরির মৃত্যুর সময় শুনি না। বরং উপন্যাসের মধ্যে ছড়িয়ে আছে আরো ব্যাপক এক ব্যর্থতা। কোয়েরির ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রশ্নে যেতে চাই না; এই বিতর্কের বাইরেও উপন্যাসে রয়েছে মানুষকে চেনা বা বাস্তবকে বোঝার ব্যর্থ প্রয়াস। এই প্রয়াস গ্রীনকে পৌঁছে দেয়, কোনো বড়ো সত্যের দোর-গোড়ায় নয়, আরেক জাতীয় রচনায়; যেখানে তাঁর পথনির্দেশক সের্ভানটেস এবং উনামুনো :

> At the end of a long journey, I found myself in that tragi-comic region of La Mancha where I expect to stay.[৯]

বাইশ বছর বাদে লেখা "মনসিন্যোর কুইক্সোট"-ই কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রার প্রতীক্ষিত পরিশেষ। গ্রীনের নায়কের পূর্বপুরুষ ("বাস্তবিক"-অর্থে) সের্ভানটেস-সৃষ্ট আরেক কাল্পনিক চরিত্র। বংশপরিচয় দিতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করলে তার শুভানুধ্যায়ী বিশপ তাকে সান্ত্বনা দেন :

> Perhaps we are all fictions, father, in the mind of God.

গ্রীনের আখ্যানশিল্পে বাস্তব ও কল্পনার যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই, তা হয়তো এই ধরনের epigram দিয়ে সমাধান করা যায় না। কথাটি কিন্তু সুন্দর। কল্পনাজগৎ কোনোদিন গ্রীনকে মুক্তি দেয় নি : লেখার মধ্যে তিনি তাঁর সমকালীন কথাশিল্পী, বোর্জেস, মার্কোয়েস, কুন্দেরার মতো স্বাতন্ত্র্য জারি করেন নি। বাস্তবজীবন ও তার শৈল্পিক রূপায়ন সম্বন্ধে নিতান্ত সেকেলে চিন্তাই তাঁর উপন্যাসে দেখি। বাস্তবের এই পরিচিত মূর্তিটি ভেঙে দিয়ে নতুন করে গড়া তাঁর কাহিনীর উদ্দেশ্য নয়। "চেনাকে অচেনা করানোর" (defamiliarization) কায়দাটা তিনি নিচ্ছেন থ্রিলারধর্মী রচনার থেকে : যা আদৌ সম্ভব নয়, তাকেই সম্ভাব্য বলে মেনে নিয়ে, "বাস্তবধর্মী" রচনার অন্তর্ভুক্ত করে। ("আউর ম্যান ইন হাভানা" এই কৌশলের চরম দৃষ্টান্ত।) কৈশোরে পড়া অ্যাডভেনচার উপাখ্যানের মধ্যে

কল্পনার যে স্বাধীনতা তিনি পেয়েছিলেন, তা উপন্যাসের আঙ্গিক-রূপ পরিবর্তনে গ্রীনকে উদ্যোগী করে নি। সে অর্থে গ্রীনের সব রচনাই "পাঠ্য", "লিখ্য" নয়—যদি আমরা lisible / scriptible, readerly / writerly-র মধ্যে বার্থ-উল্লিখিত পার্থক্য মনে রাখি।

শেষ দিকে কিন্তু বার্থও 'পাঠ্য' রচনার প্রতি নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেছিলেন[২০]; যেমন এরিস্টটল বুড়ো বয়সে বলেছিলেন মামুলি গল্পের আকর্ষণের কথা[২১]। গ্রীনের সৃষ্ট উপন্যাসের জগতে আমরা পাই, শৈল্পিক একোক্তি নয়, বাখতিনের কথায় dialogue, দ্বৈতোক্তি বা সংলাপ।

সূত্রনির্দেশিকা :

১. Pierre Macherey, *A Theory of Literary Production*, trans G. Wall (London, 1978 rpt. 1985) p. 7.

২. *Ways of Escape* (Penguin, 1981) pp. 73-4 : গ্রীন লিখেছেন যে Michael Innes-এর একটি গোয়েন্দাকাহিনী (সম্ভবত *The Daffodil Affair*) পড়ে এই ধরনের গল্প লেখার ইচ্ছা হয়েছিল।

৩. Robert Browning, *Bishop Blougram's Apology*, 395.

৪. R. Barthes, 'L' Effet de Re'el', *Communications*, 1968 : সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ইংরাজি অনুবাদ 'The Reality Effect' : R. Barthes, *The Rustle of Language*, trans. R. Howard (Oxford 1986) pp. 141-48.

৫. Samuel Johnson, Preface to *Shakespeare* (1765) : *Johnson, Poetry and Prose*, selected M. Wilson (London, 1957) p. 503.

৬. Graham Greene, 'The Explorers' : *Collected Essays* (Penguin 1970) p. 237.

৭. 'Convoy to West Africa' : *In Search of a Character* (Penguin, 1968) p. 106.

৮. 'The Explorers' : *Collected Essays ed.* cit. p. 239.

৯. *Ways of Escape*, ed. cit. p. 198.

১০. R. Barthes, 'The Image' : *The Rustle of Language* ed. cit. p. 352.

১১. Aristotle, frag. 668 ; cit. M. Detienne, *The Creation of Mythology*, trans. M. Cook (Chicago, 1986) p. xii.

লালন ফকির

আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের জটিলতাজনিত পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নাতীত, সেই লালন ফকিরের উপর লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তীর গবেষণাসমৃদ্ধ সন্দর্ভ "চতুরঙ্গে" আগামী অকটোবর ১৯৯১ সংখ্যা থেকে কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হবে।

মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমন

উত্তরা বসু

রাজপুত্র, কোথা হতে হঠাৎ এলে চলে...
সাতসমুদ্রপারের থেকে বজ্রস্বরে এলে হেঁকে
দুন্দুভি যে উঠল বেজে বিষম কলরোলে...

রবীন্দ্রনাথের গানের কথাগুলি বড়োই সত্য—মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ আমাদের দেশে রাজপুত্রের মতোই হঠাৎ এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দারুণ গ্রীষ্মে মুমূর্ষু বসুন্ধরার নিদ্রাভঙ্গ করে। তারপর মৌসুমি বৃষ্টিপাতে শুষ্ক বিদীর্ণ ভারতের মাটি হয়ে ওঠে নরম, চাষিরা মেতে ওঠে কৃষিকার্যে, অচিরেই সবুজের সমারোহে আমাদের দেশ হয়ে ওঠে মনোরম। ভারতমাতা যেন মূর্ছাভঙ্গ থেকে উঠে নতুন পুলকভরে কৃষির সৃষ্টিকর্মে মেতে যান—মৌসুমি বারিধারায় পুণ্যস্নাত হয়ে। ছোটোবেলায় শেখা মৌসুমি বায়ুর আগমনবার্তা আমাদের মনে পড়ছে—দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে আসে দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্যবায়ু—বিষুবরেখা পার হতেই ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী তা হয়ে যায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে জলীয় বাষ্পকণা সংগ্রহ করে মৌসুমি বায়ু ঘটায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত।

ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যানড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, চীন, এমনকী দক্ষিণ জাপানে পর্যন্ত মৌসুমি বায়ুপ্রবাহই জলবায়ুর দিক থেকে সর্বেসর্বা—মৌসুমি বারিপাত না হলে এতগুলি দেশে গ্রীষ্মকালীন কৃষিকার্য বন্ধ হয়ে যাবে। সত্যি কথা, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষই দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাস করে আর এই কোটি-কোটি মানুষ একান্তভাবে মৌসুমি বায়ুর উপর নির্ভরশীল। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা এই অতি প্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে খুব কম জানি আর এখনও প্রায়ই আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ভুল প্রমাণিত হয়।

এখনো বিদ্যালয়ে শিশুদের এই অর্ধসত্যটি শেখানো হয় যে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ নাকি মহাদেশীয় স্তরের স্থলবায়ু-সমুদ্রবায়ু মাত্র (Land and Sea

পঙ্কিমবঙ্গ শিক্ষা পরিষেবায় রীডার উত্তরা বসু বর্তমানে কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে ভূগোল বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।

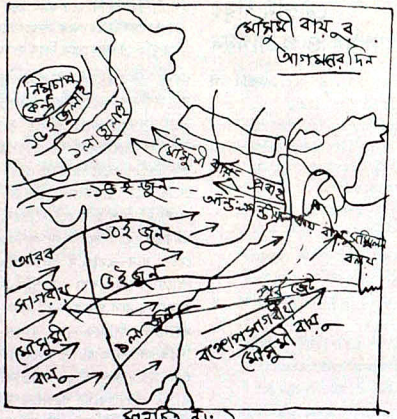

breezes on a continental scale)। এই অতিসরলীকরণের ফলে মৌসুমি বায়ুর আগমন এবং প্রত্যাগমন সম্পর্কে ভারি ভুল কতকগুলি ধারণা বয়ে গেছে। আমরা নির্বিবাদে মৌসুমি বায়ুর আগমনে বিলম্ব ঘটলে উষ্মা প্রকাশ করি—আবার, এ বছর যেমন মৌসুমি দুদিন আগে ৬ই জুন এসে উপস্থিত—তখনও আমরা বিরক্তি প্রকাশ করতে ভুলি নি। আমাদের ভেবে দেখা কর্তব্য যে, এই মৌসুমি বায়ু সমগ্র ভূগোলকের জলবায়ুর গূঢ় পরিবর্তনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

সবারই মনে পড়বে—১৯৮৮ সালে মৌসুমি বায়ুর ভারতে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়েছিল—তার ফলে সারাদেশে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল, কৃষিকার্যের হয়েছিল প্রভূত ক্ষতি—ভারতের অর্থনীতি হয়েছিল এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ভারতে মৌসুমির আগমনের বিলম্বের কারণ ছিল "এল নিনো" অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্ধে বিষুবরেখাঞ্চলে প্রবাহিত সমুদ্র-স্রোতের সহসা বিপরীতমুখী প্রবাহ। এই "এল নিনো" নামক বিপর্যয়টি কোনো বিশ্ববহিরভূত ঘটনা নয়, কয়েক বছর বাদে-বাদেই এই দুর্ঘটনাটি পৃথিবীর বুকে ঘটে আসছে। খুব সহজভাবে বোঝাতে গেলে—"এল নিনো" হচ্ছে পেরু উপকূলে শীতল কুমেরু-স্রোতের প্রবাহকে হটিয়ে দিয়ে বইতে থাকে নিরক্ষীয় উষ্ণ বিপরীত স্রোত। তার ফলে পেরুচিলি উপকূলে অনেক পাখি আর মাছ মরে যায়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সমগ্র বায়ুপ্রবাহও বিপর্যস্ত হয়ে যায়; কারণ বায়ুপ্রবাহের সমুদ্রস্রোতপ্রবাহের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সেই কারণেই "এল নিনো" হলে শুধু মৌসুমি বায়ুপ্রবাহে কেন—সমগ্র পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহে বিপর্যয় ঘটে যায়। ভাবলে আশ্চর্য লাগে—কোথায়

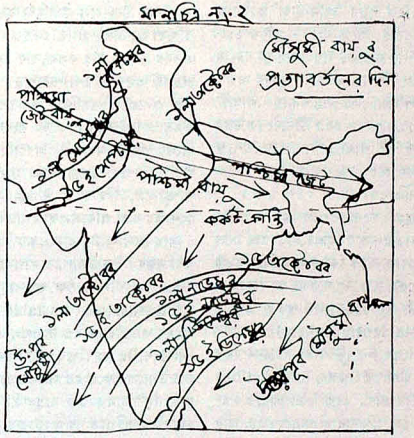

সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার পেরু উপকূলে সমুদ্রস্রোতের বৈপরীত্যের ফলে আমাদের ভারতে অন্নবস্ত্রের হাহাকার শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা তো আর বিশ্ববহিরভূত নই আর মৌসুমি বায়ুপ্রবাহই আমাদের পার্থিব বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে রেখেছে। একটা সান্ত্বনা এই যে, "এল নিনো"র পরের বছরটা সবসময়েই মৌসুমি যেন ক্ষতিপূরণ করে দিতে চায়—তাই ১৯৮৯ সালে তার কল্যাণে ভারতে প্রভূত শস্য-উৎপাদন হল—আমাদের দেশ কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পেল।

এ বছর ইরাকের যুদ্ধের ফলে, বিশেষত আরব-সাগরে তৈলস্তর ভেসে থাকার ফলে সবারই ভয় হয়েছিল যে মৌসুমি প্রবাহ হয়তো এবার বিঘ্নিত হবে। মৌসুমি বায়ু নির্ধারিত দিনের দুদিন আগেই কলকাতায় পৌঁছেছে ঠিকই; কিন্তু বিহার, উত্তর-প্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতের কোনো-কোনো অংশে এখনও মৌসুমি বারিপাত যথোচিত পরিমাণে হয় নি—তবে তা কতখানি ইরাক যুদ্ধের ফলস্বরূপ উষ্ণতার জন্য, আর কতখানি জলবায়ুর বিপর্যয়ের জন্য—তা এখনি বলা খুব কঠিন।

মৌসুমি কথাটি আরবি শব্দ "মৌসিম" অর্থাৎ ঋতু থেকে নেয়া, এবং নামটি বড়োই সার্থক। কারণ, মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শীত থেকে গ্রীষ্মে বায়ুপ্রবাহের সম্পূর্ণ দিক-পরিবর্তন (complete reversal of the wind system)। পৃথিবীর আর কোনো জলবায়ু অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের এমন আমূল দিক-পরিবর্তন হয় কিনা সন্দেহ।

শীতকালে উত্তর সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা বেয়ে

পশ্চিমাবায়ু প্রবাহিত হয়। তখনি ঊর্ধ্ব আকাশে পশ্চিমা জেট বায়ুপ্রবাহ চলতে থাকে— ঘণ্টায় ১৪৮ মাইল বেগে। এই পশ্চিমা জেট বায়ুপ্রবাহ দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে তিব্বতীয় উচ্চমালভূমির দ্বারা। তিব্বতের উত্তরে পশ্চিমা জেট বায়ুপ্রবাহের শাখাটি মাত্র ৫৫ মাইল বেগে ধাবিত হয়। চীনদেশের উপর জেট বায়ুপ্রবাহের দুই শাখা মিলিত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে উত্তর আমেরিকার দিকে ধাবিত হয় প্রবলগতিতে।

এই জেট বায়ুপ্রবাহ প্রকৃতপক্ষে এক পাড়হীন নদীর মতো—প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। তার ফলে এই "জেট" বায়ুপ্রবাহ থেকে কিছুটা বায়ু নিম্নাভিমুখী হয় (subsidence), যার ফলে উত্তর ভারতে পুরো শীতকালে, এমনকী শুষ্ক গ্রীষ্মকালেও শুষ্ক ও প্রধানত স্থির আবহাওয়া (stable atmosphere) পরিলক্ষিত হয়। কারণ বাতাসের নিম্নমুখী প্রবাহ মানেই স্থির আবহাওয়া আর ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ (convection) মানেই অস্থির আবহাওয়া। তবে, উত্তর ভারতে সমভূমিতে শীতকালে যে পশ্চিমাবায়ু প্রবাহিত হয়, তার সঙ্গে ইওরোপ থেকে মাঝেমাঝে দু-চারটি মৃতপ্রায় (occluded) পশ্চিমা ঘূর্ণিঝড় (western disturbance) পরিবাহিত হয়ে আসে। এই দুর্বল ঘূর্ণিঝড়গুলিই ডিসেমবরের শেষ দিক থেকে ফেবরুয়ারির প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্বল্পপরিমাণ বৃষ্টিপাত ঘটায় উত্তর ভারতে—যা রবিশস্য উৎপাদনের জন্য মহামূল্যবান। ফেবরুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ভারতে উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে, কারণ সূর্য তখন ভারত মহাসাগরের উপর বিষুবরেখায় লম্বকিরণ দিতে থাকে। মার্চ মাস থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত ভারতে শুষ্ক ও প্রচণ্ড উষ্ণ গ্রীষ্মঋতু চলতে থাকে—কারণ সূর্যের লম্বকিরণ বিষুবরেখা (০°) থেকে ক্রমশ কর্কটক্রান্তির (২৩½° উত্তর অক্ষরেখা) দিকে সরতে থাকে। ফেবরুয়ারির শেষ দিকেও ভূমধ্যসাগরীয় পশ্চিমাঝড়গুলি (western disturbance) উত্তর ভারতে আসতে থাকে, কিন্তু বায়ু উষ্ণ বলে ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় প্রায়শই এই পশ্চিমা ঝড়গুলিই রূপান্তরিত হয় কালবৈশাখীর ঝড়ে। এ বছর ও গত বছর কলকাতায় ফেবরুয়ারির শেষে দুয়েকটি এই জাতীয় পশ্চিমা ঝড় থেকে কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা ও স্বল্পবৃষ্টি হয়েছিল। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ক্রমশ কালবৈশাখীর ঝড়ের সংখ্যা বাড়তেই থাকে গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্র-মহানদী অববাহিকায়। শুষ্ক গ্রীষ্ম ঋতুতে (মধ্য-ফেবরুয়ারি-মে) আসামে, বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গে, বিহার ও উড়িষ্যার সমভূমিতে কালবৈশাখীর দ্বারা পরিচালন বারিপাতই একমাত্র বৃষ্টিপাত —যার ফলে আউশ ধান ও অন্য কিছু ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। উচ্চ উত্তাপ, বঙ্গোপসাগরাগত উষ্ণ আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ, পশ্চিমা উষ্ণ শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে সম্মিলন ও অশান্ত আবহাওয়া (unstable lapse rate)—এইসব কারণের মিলিত ফলাফল এই প্রবল বিধ্বংসী কালবৈশাখীর ঝড়। শুষ্ক গ্রীষ্মে উত্তর-পশ্চিম ভারতে উচ্চ উত্তাপের ফলে হয় আঁধি ঝড়, যাতে উত্তাপ কমে যায়, "লু" নামক উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ কিছুক্ষণ ব্যাহত হয়, কিন্তু বৃষ্টিপাত খুব একটা হয় না। দক্ষিণভারতে শুষ্ক গ্রীষ্মে ঘটে "আম্রবৃষ্টি" (mango showers) যাতে সামুদ্রিক বায়ুপ্রবাহের গুরুত্ব সমধিক। ১৯৯০ সালে অন্ধ্র উপকূলে ও ১৯৯১-এ বাংলাদেশ অববাহিকায় যে প্রবল বিধ্বংসী ছুটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবাত্যা হাজার-হাজার মানুষকে গৃহহারা, খাদ্যহারা করে কত হাজার মানুষের ও পশুর প্রাণহরণ করে চলে গেল ; আমরা পূর্বাভাস সত্ত্বেও অসহায়ভাবে লক্ষ করলাম—ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝঞ্ঝার অমানুষিক ধ্বংসক্ষমতা। ১৮৯২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত অন্ধ্র উপকূলে মোট ৬৮ বার ঘূর্ণিবাত্যা এসেছে, তার মধ্যে ২৮টি ছিল ভয়াবহ ধ্বংসকারী। এর মধ্যে ৬টি ঘূর্ণিঝঞ্ঝাই এসেছে মে মাসে। বাংলাদেশ উপকূলে এই শতাব্দীতেই এসেছে ১১টি ঘূর্ণিঝঞ্ঝা, তার মধ্যে ১৯৭০-এর ঝড়টিতে প্রাণ হারিয়েছিল দশ লক্ষ মানুষ। এ বছরের ঝড় ছুটিতে মানুষের প্রাণ তো গেছেই, অন্তত লক্ষাধিক—কিন্তু

জমি, গৃহ, পশুপাখির ক্ষতি হয়েছে ব্যাপকতর। আধুনিক মানুষের সভ্যতা আজও এই ঘূর্ণিঝঞ্ঝার হাতে অসহায় ক্রীড়নকমাত্র।

প্রবল উত্তাপের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাকিস্তানের মহাদেশীয় অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয় এক গভীর নিম্নচাপকেন্দ্র, পশ্চিমা জেট বায়ুপ্রবাহ সরে যায় তিব্বতের উত্তরে, দক্ষিণ ভারতে ১৫° উত্তর অক্ষরেখায় অবস্থান করে এক পূর্ব জেট বায়ুপ্রবাহ—বিষুবরেখা থেকে উত্তরে সরে এসে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর সীমান্তে ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় দক্ষিণ কিনার ঘেঁষে অবস্থান করে অন্তঃক্রান্তীয় বায়ুসম্মিলনবলয়। সহসা ১ জুন মহাসমারোহে রাজপুত্র "মৌসুমি"র আবির্ভাব হয় কেরালায় ও মেঘালয় পার্বত্য অঞ্চলে। সে এক অতি নাটকীয় দৃশ্য। ঘোরঘনরবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহযোগে প্রবল বর্ষণকলরোলে রাজপুত্র মৌসুমির ঘটে আবির্ভাব। কেরালার বৃষ্টিপাত ঘটে আরব-সাগরীয় মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ থেকে, আর মেঘালয় ও অসম পর্বতমালায় বৃষ্টি আনে উদ্দাম বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমি বায়ুস্রোত। দুইটি মৌসুমি বায়ুপ্রবাহই দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে উপমহাদেশীয় অভ্যন্তরের গভীরতম নিম্নচাপ-কেন্দ্রটির দিকে। দুইটি মৌসুমি বায়ুর শাখাই বহন করে নিয়ে যায় একের পর এক মৌসুমি ঘূর্ণিঝড় (monsoon depressions)। সাধারণত মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়গুলি হয় শান্ত প্রকৃতির, ঝিরিঝিরি বারিবর্ষণে দেশকে করে স্নিগ্ধ—কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে এই ঋতুতে। এরকম মৌসুমি ঘূর্ণি-ঝড় বঙ্গোপসাগর থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় উত্থিত হয়—আরব সাগরের তুলনায়। তার কারণ—আরব সাগরের আকাশের অনেক উপরে ক্রান্তীয়, উচ্চচাপ বলয়ের উপস্থিতির জন্য এত বেশি ঘূর্ণিঝড় উঠতে পারে না। ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরবসাগরীয় মৌসুমি বায়ু শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটার ১০০″ অর্থাৎ ২৫৪ সেনটিমিটার। পশ্চিমঘাটের চ্যুতিজনিত সৃষ্ট ৫০০০ ফুট উচ্চ চূড়া পেরিয়ে যখন আরব সাগরীয় মৌসুমি দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়—তখন ওই বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে এক বিশাল ত্রিকোণাকৃতি এলাকায় অত্যন্ত সীমিত বৃষ্টিপাত দেখা যায়। বঙ্গোপসাগরীয় মৌসুমি বায়ু মেঘালয়ের দক্ষিণে মৌসিন রূপে—চেরাপুঞ্জিতে ঘটায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত (১১৪১ সে. মি.)।

কলকাতায় মৌসুমির আবির্ভাব দিবস ৮ই জুন—তবে রাজপুত্র মৌসুমি যে কোন্ বছর কখন আসবেন তা কি বলা যায়? এবারে তিনি দুদিন আগে এলেন, গত বছর এসেছিলেন ১০ দিন পরে। মহামান্য অতিথির এহেন বিচ্যুতি অবশ্যই ক্ষমার্হ। বম্বেতে আরবসাগরীয় মৌসুমির পৌঁছানোর কথা ১০ই জুন—প্রবল বারিপাতে শহরটিকে ধুইয়ে দিয়ে তাঁর ঘটে আবির্ভাব। ১৫ই জুনের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের আওতায় চলে আসে। আরো একমাস লাগে থর মরুভূমির প্রান্তে পশ্চিমে পাকিস্তান সীমান্তে পৌঁছতে। যত তাড়াতাড়ি দক্ষিণ-পূর্ব ভারত অতিক্রম করে "রাজপুত্র" মৌসুমি—ততই যেন শ্লথ-গতি হয়ে পড়ে বিপদসঙ্কুল উত্তর-পশ্চিম ভারতে পৌঁছে! ১৫ই জুলাই সারা ভারতের উপর মৌসুমির আবির্ভাব ঘটে যায় (মানচিত্র ১)।

তবে বারিপাত যে ঘটে, তা মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নয়—এই বায়ু বহন করে কিছু ঘূর্ণিঝড় (monsoon depressions)। সেগুলিই প্রকৃত মৌসুমি বারিপাতের কারণ। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সারা ভারতই মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের আওতায় চলে আসে ও সর্বত্র মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান, গতি ও প্রকৃতি অনুসারে বৃষ্টিপাত হতে থাকে। যেখানে উচ্চ পর্বত বা মালভূমি অবস্থিত, সেখানেই প্রবল শৈলোৎ-ক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয়, যেমন হিমালয়ের পাদদেশে। তাই দার্জিলিঙে যতটা বৃষ্টি হয়, কলকাতায় এতটা হয় না। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি বন্ধ থাকে, তখন উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া অসহ্য হয়ে ওঠে। মৌসুমি বৃষ্টির সমস্যা হল শুধু যে আরম্ভ হতে দেরি হয় তা নয়, শেষ হতেও

দেরি হতে পারে, আবার কোথাও অতিবৃষ্টি আর বন্যা' এবং অন্য অঞ্চলে অনাবৃষ্টি আর খরা চলতেই থাকে। এ ব্যাপারে চাষিরা যেমন অসহায়, বৈজ্ঞানিকরাও তেমনি সুরাহা করতে অপরাগ। পুরো জুলাই-অগস্ট সারা ভারতে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে বারিপাত ঘটিয়ে যায়।

সেপটেমবরে সূর্যের লম্বকিরণ আবার কর্কটক্রান্তি থেকে সরে গিয়ে বিষুবরেখায় ফিরে যায়। তখনি শুরু মৌসুমির প্রত্যাবর্তনের পালা। মৌসুমি বায়ুর ১লা জুন ভারতে পৌঁছে, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগে মাত্র দেড় মাস। ১৫ই জুলাই থর মরুভূমির পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত মৌসুমি বারিধারায় স্নিগ্ধ হয়। অথচ ভারত ছেড়ে যাবার সময় মৌসুমি বায়ুর লাগে মধ্য সেপটেমবর থেকে ডিসেমবরের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সাড়ে তিন মাস। প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমি যেন আমাদের ছেড়ে যেতেই চায় না—ভারতমাতার পায়ে কেঁদেকেটে শেষে বিদায় নেয়! যেখানে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি শেষ পৌঁছেছিল ১৬ই জুলাই—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে—সেখান থেকেই মৌসুমির প্রত্যাবর্তন শুরু হয় ১৫ই সেপটেমবর। ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে পুরো উত্তরভারত, এমনকী মধ্যভারত গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবমুক্ত হয়ে পড়ে। সেপটেমবরের শেষ থেকেই শুরু হয় মৌসুমির বিদায়-কালীন তাণ্ডব। মনে পড়ছে কি ১৯৭৮ সালে প্রত্যা-বর্তনকারী মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সেপটেমবরের শেষ দিকে কলকাতার রাস্তায় নৌকা চলেছিল? আবার ১৯৮৬ সালে সেপটেমবরে কলকাতাকে তিন-দিনের জন্য অচল করে দিতে এল প্রত্যাবর্তনশীল মৌসুমির ঘূর্ণিঝড় আর অতিবৃষ্টি। এর চেয়েও ভয়াবহ ছিল ১৯৭৭ সালের অন্ধ্র উপকূলের ঝড় যা ১০,০০০ মানুষের প্রাণহরণ করেছিল আর কত লক্ষ মানুষকে করেছিল গৃহহীন, সহায়সম্বলহীন। এবারে দুর্গাপুজোর ঠিক আগে মৌসুমি রাজপুত্র কোন্ বিধ্বংসী খেলা খেলবেন—কোনো বৈজ্ঞানিকই তা বলতে পারবেন না।

১৫ই অকটোবর থেকে ডিসেমবরের শেষ পর্যন্ত ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে তামিলনাড়ু ও কেরালায় চলতেই থাকে মৌসুমির অশ্রুপ্লাবিত বিদায়পর্ব। কোনো-কোনো আবহাওয়াবিদ্ বলেন, উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু (অর্থাৎ বাণিজ্যবায়ু) অকটোবর থেকে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়। প্রকৃত-পক্ষে তামিলনাড়ুতে শীতকালেও ঠাণ্ডা পড়ে না ও প্রত্যাবর্তনজনিত ঘূর্ণিঝড়গুলিই আনে শীতকালীন বৃষ্টিপাত। তামিলনাড়ুতে দুবার বৃষ্টিপাত হয়—প্রথমে জুলাই-অগস্টে ও আবার নভেমবর-ডিসেমবরে।

একথা ঠিক যে মৌসুমির আবির্ভাবের সময়টিতে যেমন পশ্চিমা জেট বায়ুপ্রবাহের তিব্বতের উত্তর-প্রান্তে পশ্চাদপসরণ অত্যাবশ্যক—তেমনি মৌসুমির ভারত থেকে তিরোধানের সময় দক্ষিণভারতীয় উচ্চ আকাশের উপর থেকে পূর্ব জেট বায়ুপ্রবাহের বিষুব-রেখার দিকে প্রস্থান অতি প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ জেট-স্ট্রীমদ্বয়ের অবস্থান ও প্রস্থানই দক্ষিণ এশিয়ায় মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের আগমন ও নিষ্ক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করছে।

অকটোবর থেকে সিন্ধু-গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উপর দিয়ে অনেক উঁচুতে আকাশে বইতে থাকে প্রবলপ্রতাপশালী পশ্চিমা জেটবায়ুপ্রবাহ—যার কথা প্রথমেই বলেছি। নভেমবরে বইতে থাকে উত্তরভারতে ইওরোপাগত শুষ্ক শীতল পশ্চিমাবায়ু, আর সেই বায়ু-তাড়িত হয়ে এসে পৌঁছায় ভারতে কয়েকটি মৃতপ্রায় ঘূর্ণিঝড় (Occluded midlatilude cyclones)। এই দুর্বল নিম্নচাপকেন্দ্রগুলিই ঘটায় স্বল্প অথচ বহুমূল্য শীতকালীন বৃষ্টিপাত, যা উত্তরভারতে রবিশস্য উৎপাদনে সাহায্য করে। সুদূর দক্ষিণভারতে অকটোবর থেকে ডিসেমবরে চলতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রত্যাবর্তনপর্ব এবং বায়ুপ্রবাহ হয়ে যায় মূলত দক্ষিণপূর্ব মৌসুমিবায়ু যা আসলে বাণিজ্যবায়ু (trade winds)।

তাহলে আমরা দেখছি যে আর্দ্র গ্রীষ্মকালে উত্তর-

ভারতে আমরা পাই উত্তর-পূর্ব মৌসুমিবায়ু—আসাম থেকে থর মরুভূমির দিকে প্রবাহিত। তখনই দক্ষিণ-ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমিবায়ু আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে যুগপৎ দুইটি শাখায় প্রবাহিত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে সারা দেশে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেই সময় দক্ষিণভারতের ১৫° উঃ অক্ষরেখায় অবস্থান করে পূর্বজেট—আকাশের অনেক উঁচুতে। শীতকালে ঠিক এর বিপরীত বায়ুপ্রবাহ আমরা ভারতে দেখছি। তখন উত্তর ভারতে ঊর্ধ্বাকাশে পশ্চিমা জেটপ্রবাহ ও নিম্নে সিন্ধু-গাঙ্গেয়-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহ দেখছি। তেমনি শীতকালে নভেমবর-ডিসেমবরে দক্ষিণভারতে উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বা মৌসুমিবায়ু প্রবাহিত হয়—যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমিবায়ুর বিপরীতবাহী। তাহলে দেখছি, প্রকৃতই ভারতে গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকালে বায়ুপ্রবাহের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটে। স্বভাবত দুইটি অন্তবর্তী ঋতুতে অর্থাৎ শুষ্ক গ্রীষ্মে ও শরৎ-হেমন্তে সারাদেশে তাণ্ডবসৃষ্টিকারী ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা থেকেই যায়—কারণ এই দুই অন্তর্বর্তী ঋতুতেই বায়ুপ্রবাহের সম্পূর্ণ দিকবদলটি সম্পন্ন হচ্ছে। সেইদিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশে মৌসুমিবায়ুপ্রবাহ এক অতুলনীয় জলবায়বিক ঘটনা—যার সঙ্গে আমাদের দেশের কোটি-কোটি মানুষের আত্মিক যোগাযোগ। শুধু ভারতই বা কেন—পুরো দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার সব দেশগুলিতেই মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দেখা যায়। সত্যিই তাই পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের লীলাখেলার দিকে ভয়, বিস্ময় আর ভালোবাসা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

শরৎ-শিরাজী-সত্যেন্দ্রনাথ

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ : শরৎসাহিত্যে কিছু জিজ্ঞাসা

শরৎসাহিত্যের পাঠক আর সমালোচকের দিগন্তটি সত্যি বহুধা বিস্তৃত। গ্রামবাঙলার সাধারণ গৃহবধূ থেকে লেনিনের পাশে বসা দুর্দান্ত বুদ্ধিজীবী এম. এন. রায়; বিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট-পিপাসু অধ্যাপক; সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতো সাহিত্যসমালোচক থেকে শিবদাস ঘোষের মতো সমাজবদলের নেতা—শরৎচন্দ্র সকলকেই আকর্ষণ করতে লক্ষণীয়ভাবে সফল হয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রসূনকুমার চক্রবর্তীর "প্রসঙ্গ : শরৎ-সাহিত্য : কিছু জিজ্ঞাসা" বইটি হাতে আসায় জানা গেল পেশায় ইঞ্জিনীয়ার অধ্যাপককে দিয়ে সাহিত্য বিষয়ে কম্পিউটার ও ডেটা-ফীডিং পদ্ধতিতে প্রথম কোনো গ্রন্থ লিখিয়ে নেওয়ার মতো চৌম্বক বৈশিষ্ট্য আজও শরৎচন্দ্রের বর্তমান।

ভূমিকা অংশ পড়ে জানা যায়, জনৈকা পাঠিকা এ বই পড়ে মন্তব্য করেছেন, 'এরকম লেখা নেই, হয় নি, হবে না।' কৌতূহলী পাঠক স্বভাবতই এমন একটি বইয়ের অন্দরমহলে উঁকিঝুঁকি মারবেন।

খুব বড়োসড়ো বা টানা লেখা কোনো বই নয়। ১১টি প্রবন্ধের একটি পাতলা বই। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০। শরৎসাহিত্যের মহত্ত্ব নিয়ে যেসব মিথ পাঠক-বা পণ্ডিত-মহলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তার বিরুদ্ধে লেখক কতকগুলি বিপরীত বক্তব্য বা জিজ্ঞাসা আনতে চেয়েছেন। বক্তব্যের সমর্থনে দিশি-বিলিতি সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বা চরিত্রের কথা আনায় তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের একটি আবহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে দরদি কথাসাহিত্যিক বিশেষণটি বহুল ব্যবহৃত। হৃদয়হীন সমাজের দ্বারা নিষ্পিষ্ট নারী-হৃদয়ের অক্ষয় রূপকার হিসাবেও তিনি বিশিষ্ট। শ্রী চক্রবর্তী বলতে চেয়েছেন—তিনি দরদি বটে, তবে তাঁর দরদ সাধারণ মানুষ তেমন পায় নি, পেয়েছে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা। "জমিদার রমেশ বিপ্রদাস জীবানন্দের কথা" প্রবন্ধে তিনি দেখাতে চেয়েছেন—দরদি কথাসাহিত্যিক সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের উদ্ধারের মহৎ কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন (humanizing of the antihuman)। বিপ্রদাসে আছে কুলীন ব্রাহ্মণের কুমারী-আসক্তির গল্প যা 'সামাজিক অপরাধের রকমফের মাত্র' (পৃ ৮)। "পল্লীসমাজে" আছে 'পল্লীসমাজের নিন্দার নানা বিবরণ', "গৃহদাহে" আছে 'পরস্ত্রীগমনের স্থূল চিত্রণ' (পৃ ২৯)। সাহিত্যের মন্দ প্রভাবকে ঢেকে রাখার মতো প্রয়োজনীয় সাহিত্যিক উপকরণের দৈন্যও প্রকট।

ত্যাগ ও সেবাপরায়ণতার ভারতীয় আদর্শকে ব্যবহার করে শরৎচন্দ্র পতিতা-জীবনকে কালিমা- ও গ্লানি-মুক্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন। লেখকের মতে, 'সেবাপরায়ণতার আদর্শের স্পর্শে পতিতা উদ্ধারের এই ধরনের প্রচেষ্টা (humanizing of the anti-human) সামাজিক ইতিহাসের বিকৃতির নামান্তর ও দুরভিসন্ধিমূলক' (পৃ ১৫)। "শরৎসাহিত্যে বিক্ষুব্ধা নারীদের কথা" প্রবন্ধে লিখেছেন, 'শরৎসাহিত্যে নারী-স্বাতন্ত্র্যের কথা বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদের উপরে উঠতে পারে নি। বক্তব্যের এখানে সেখানে হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ টেনে আনা এর সাহিত্যিক মূল্যকে যথেষ্ট হ্রাস করেছে' (পৃ ৩৭)। লেখক জিজ্ঞাসা করেছেন—দরদি কথাসাহিত্যিক 'কিরণময়ীর হৃদয়ের সুবৃত্তির বিনাশ ঘটিয়ে (dehumanizing of the human) তাকে বেবুশ্যেদের পরিবেশে কুৎসিত পরিবর্তনের পঙ্কের মধ্যে টেনে নামালেন কোন্ মানবিকতাবোধের প্রয়োজনে' (পৃ ৩৭)। জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য একদিকে কমল, অভয়া, অন্য-দিকে বিরাজবউ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাঁর এই বিপরীতধর্মী দ্বিমুখিতায় তাঁর 'চিন্তা ও মননের সততা (honesty)' প্রকাশ পায় নি। নতুনদা চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন, 'দেনাপাওনার জীবানন্দের মতো একেও ক্ষমা ঘেন্না করে সমালোচনায় এত কঠোর ভাব না দেখালেও হয়তো ভালোই হত' (পৃ ৪২), ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঠককে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না—শ্রী চক্রবর্তীর এইসব জিজ্ঞাসা কোনো সৎ সাহিত্য-বোধ থেকে উত্থিত নয়; কোনো প্রগতিশীল সমাজ-দৃষ্টিও এর পেছনে নেই। তা যদি থাকত, তা হলে তিনি পল্লীসমাজের প্রসঙ্গে এমিল জোলার সাহিত্যে শোষণ এবং গণবিক্ষোভের দক্ষ দৃশ্যপট দেখতে পেতেন না। কমল, পিয়ারী বাইজী, অভয়া, কিরণময়ী চরিত্রে যাঁর পিউরিটানসুলভ ঘোর আপত্তি, তিনি মোরাভিয়ার মুগ্ধ পাঠক কী করে হতে পারেন? ইবসেনের "ডলস হাউস" বা শার্লট ব্রন্টির নায়িকারা দাম্পত্য সম্পর্কের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ এনেছে, তার আভিজাত্য ও মৌলিকতায় গ্রন্থকার মুগ্ধ তাহলে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে 'feminist বা সংকীর্ণ নারী-বিচ্ছিন্নতাবাদের' অভিযোগ কেন? বক্তব্যের অগভীরতা তাঁর অভিযোগের মূল কারণ, নাকি 'বক্তব্যের এখানে সেখানে হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ টেনে আনা এর সাহিত্যিক মূল্যকে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করেছে' (পৃ ৩৭)—এইখানে রয়েছে গ্রন্থকারের শরৎবিদ্বেষণের মূল রহস্য। লরেন্স, জোলা, মোরাভিয়া, শ, বালজাক, এমনকী টি. এস. এলিয়ট—কত লেখকের কথাই গ্রন্থকার শরৎচন্দ্রকে খাটো করার জন্য নিয়ে এলেন, কিন্তু ভেবে বেশ কৌতুক বোধ হয়—টলস্টয় বা ডিকেন্সের কথা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির প্রসঙ্গে তাঁর তেমন করে মনে পড়ল না। প্রবন্ধগুলির বাঁধুনি এত শিথিল, প্রসঙ্গগুলি এত অকারণ জায়গা জুড়ে আছে যে মূল বিষয়টাকে অনেক সময় আই. বি. লাগিয়েও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়। "সংসারবিমুখ নানা চরিত্র" প্রবন্ধে গ্রন্থকার মহাস্থবির জাতকের গল্প শুনিয়েছেন পাঁচ পাতা পড়ে। প্রবন্ধটি আট পাতার। গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে ("পুনশ্চ") রবীন্দ্রনাথের "পোস্টমাস্টার" ও "যোগাযোগ"-এর গল্প বলতে-বলতে লেখক শেষ পর্যন্ত ভুলেই গেলেন তিনি কিজন্যে এসব গল্প বলছেন? কম্পিউটারে ব্যবহৃত ডেটা-ফীডিং পদ্ধতির অনুসরণে রচিত আলোচনা অতঃপর এইরকমই হবে হয়তো।

সমালোচনা যেমন সর্বসমর্পিত স্তুতির নম্রতা নয়, তেমনি বিদূষণমনস্ক পণ্ডিতের মাতব্বরিও নয়। গ্রন্থটি সম্পর্কে ভূমিকাংশে জনৈকা পাঠিকার একটি মন্তব্য উদ্ধার করা হয়েছে—'এরকম লেখা নেই, হয়নি, হবে না'। তার সঙ্গে একটু সামান্য সংযোজনী আনা যেতে পারে—'যেন না হয়। অলমিতি।' ইংরাজিতে একটা কথা আছে 'debunking'—মাননীয়কে টেনে নীচে নামানো। এ হচ্ছে ডিবাঙ্কিং-জাতীয় আলোচনা-গ্রন্থ। নিবিষ্ট বিশ্লেষণ অনেকটা ধ্যানের মতো, চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত পাঠক তাকে এড়িয়ে যান, অথচ ডিবাঙ্কিং-জাতীয় গ্রন্থের চারপাশে দ্রুত ভিড় জমে ওঠে। একজাতের লেখক সস্তায় বাজিমাত করার জন্য বেছে নিচ্ছেন ওই ভিড়টিকে। বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের এটা একটা লক্ষণ। পাণ্ডিত্যের নানা ছদ্মবেশ নিয়ে

প্রসঙ্গ : শরৎসাহিত্য : কিছু জিজ্ঞাসা—প্রসূনকুমার চক্রবর্তী। কথা ও কাহিনী / বুকসেলার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। ষোলো টাকা।

স্বদেশী যুগে কারাদণ্ডিত কবি সিরাজী—ড. শিশির কর। সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার স্টল নং ১৬, কলিকাতা-৭৩। সাড়ে সতেরো টাকা।

কবি ও কবিতার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—সম্পাদনা শীতল চৌধুরী, অনুরাধা মিত্র / পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। ত্রিশ টাকা।

এই অবক্ষয় বাঙলা গ্রন্থের রাজ্যেও সমুপস্থিত।

স্বদেশী যুগে কারাদণ্ডিত কবি সিরাজী

ড. শিশির করের "স্বদেশী যুগে কারাদণ্ডিত কবি সিরাজী" গ্রন্থটিকে মূল্যবান বলে বিবেচনা করার অন্তত তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে এপার-বাঙলার বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের একটি অপরূপ অজ্ঞতা তথা উপেক্ষা আছে। অন্তত ২০টি গ্রন্থের রচয়িতা ও মুকুন্দদাস-নজরুলের সমগোত্রীয় স্বাজাত্যপ্রেমী এক কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীকে (১৮৮০-১৯৩১) গ্রন্থকার আমাদের গোচরে এনে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের জন্য নয়, "অনলপ্রবাহ" নামক কাব্যগ্রন্থ রচনার অপরাধেই সিরাজীকে (১৪ সেপটেম্বর, ১৯১০) দু বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল। তথ্যপ্রমাণসহযোগে তা এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হওয়ায় সিরাজীই কারাদণ্ডে দণ্ডিত প্রথম বাঙালি কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তৃতীয়ত, "অনলপ্রবাহ" কাব্যগ্রন্থের দুটি সংস্করণ এখানে মুদ্রিত হওয়ায় পরের মুখে ঝাল খাওয়ার আর দরকার রইল না। আমরা স্বচক্ষে কাব্যটি পড়ার সুযোগ পেলাম।

অন্যূন পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে বাঙলার মুসলমান সমাজ উনিশ-শতাব্দীর রেনেসাঁসের দৌড় শুরু করেছিল। মীর মোশাররফ হোসেন থেকেই সেই দৌড়ের সাহিত্যিক সূচনাবিন্দু (১৮৭০) ধরা হয়। বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রকাশ তথা উজ্জীবনের সেই বিলম্বিত প্রবাহে যাঁরা গতিদান করেছিলেন, সিরাজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, কাব্যগ্রন্থ প্রভৃতি যাবতীয় লেখার বীজমন্ত্র বা প্রেরণাসূত্র হিসাবে কাজ করেছে মুসলমান সমাজের জাগৃতির আকাঙ্ক্ষা। ড. কর অবশ্য এদিক থেকে সিরাজীকে আলোকিত করেন নি। কিন্তু সিরাজীর লেখায় মুসলমানত্বের আত্যন্তিকতা লক্ষ করে পাঠক তাঁর প্রতি যাতে অবিচার করে ফেলতে না পারেন, সেজন্য এ দিকে একটু আলো ফেলার বোধ হয় দরকার ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের চ্যালেনজের মুখে পড়তে হয়েছিল মুসলমান সমাজের জাগরণকে। ফলে তার মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়াধর্মী মানসিকতা কাজ করছিল। সিরাজীর বহু লেখার মধ্যে তার ঘোষিত রূপ দেখা যায়। তথাপি মনে রাখতে হবে—মুসলমান জাগরণের মধ্যে মৌলবাদের যে টান ছিল তার অগ্নিপরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল দুটি—এক : উর্দু না বাঙলা এই বিতর্ক। সিরাজী ছিলেন বাঙলা ভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির পক্ষে। দুই : কূটনীতির কারণে ব্রিটিশ শাসকরা মুসলিম জাতিস্বাবাদকে উশকে দিতে চেয়েছিলেন। As the Anglo-Muslim gulf was bridged the Hindu-Muslim gulf was widened (Jayanti Maitra, *Muslim Politics in Bengal*, p. 6)। সুতরাং মুসলিম মৌলবাদী ও সুবিধাবাদী শক্তির প্রবণতা ছিল 'pro-British and anti-Hindu'। সিরাজী এই পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় জাগরণ ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী। সেই কারণেই তাঁর গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত। তিনি কারাদণ্ডিত। ড. কর সিরাজীকে স্বাজাত্যবোধের অগ্নিবর্ষী কবি হিসাবেই আলোকিত করতে চেয়েছেন এ গ্রন্থে। সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে 'জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা ছিলেন তিনি।' সিরাজী সাহেব সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যে সৈয়দ আবদুর রহমান ফেরদৌসীর পত্রে এই বক্তব্যের সমর্থন আছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা নেই। কীরকম কংগ্রেস নেতা? হলে অবশ্যই মডারেটপন্থী নয়, চরমপন্থী। রাজরোষ তাঁকে চরমপন্থীর সম্মানই দিয়েছে। কিন্তু বাঙলার চরমপন্থী বিপ্লবীরা তো এগিয়েছিলেন হিন্দু পুনর্জাগরণের পথ ধরে। সিরাজীর পক্ষে সে পথের পথিক হওয়া সম্ভব ছিল না। তবে

কি মুসলিম জাগরণের মধ্যে চরমপন্থার কোনো ধারা ছিল? নাকি কংগ্রেস নেতা হিসাবে সিরাজীকে দেখানোর মধ্যে একটি অতিসরল সাধারণীকরণ কাজ করেছে? সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে সৈয়দ মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছিলেন (ইসলামদর্শন, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩১) 'অসহযোগ মরিয়াছে। সুদীর্ঘ চারিটি বর্ষ দেশে অমঙ্গলের বান ডাকাইয়া অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বিপুল ঝঞ্ঝায় দেশের উন্নতি প্রতিহত এবং জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করিয়া এতদিনে সত্যই উহার পাপ-দেহের অবসান হইয়াছে।' ইত্যাদি। এ তো কংগ্রেস নেতার কথা নয়। যোগ্য জনেরা বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা উপকৃত হবেন। সেজন্যই প্রশ্নটি তোলা।

সব প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা একটি সূচনাগ্রন্থ করবে, তা আশা করা যায় না। ড. কর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও সরকারি অভিলেখাগার থেকে বাজেয়াপ্ত বইয়ের পাঠ ও কারাদণ্ডের নথিপত্র উদ্ধার করে যথার্থ গবেষকের কাজ করেছেন। এ বিষয়ে সরকারি কাজ-কর্মের একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। '*Patriotic Poetry Banned by the Raj*' নামে একটি বই সম্প্রতি ভারতের জাতীয় অভিলেখাগার থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যেসব কবিতার বই ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, তার তালিকা এ গ্রন্থে আছে। এতে বাজেয়াপ্ত চারটি বাঙলা কাব্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। "দেশের ডাক"—জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, "মাতৃ আদেশ"—বৈকুণ্ঠচরণ দাস, "শতবর্ষের বাঙলা"—মতিলাল রায়, "যুগবাণী"—নজরুল ইসলাম। মজার কথা হচ্ছে, চারটি বইয়ের কোনোটিই কবিতার বই নয়। "নির্বাসিত সাহিত্য" গ্রন্থের লেখক হিরণ্ময় ভট্টাচার্য এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে নির্বাসিত বাঙলা কাব্যগ্রন্থের একটি তালিকা করে দিয়েছেন, তাতে অন্তত ৩৫টি বাজেয়াপ্ত কাব্যের নাম পাচ্ছি। এবং অবশ্যই তার মধ্যে সৈয়দ সিরাজীর "অনলপ্রবাহ" রয়েছে। ড. কর করেছেন তার পরের কাজ। সিরাজীর বিরুদ্ধে হোম ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিংস ও সিরাজীর বিরুদ্ধে ডি. সুইনহোর (চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট) বিচারের রায় সহ "অনলপ্রবাহ" কাব্যগ্রন্থের দুটি সংস্করণ প্রকাশ করে একটি মূল্যবান কাজ করেছেন। নজরুলের "অগ্নি-বীণা"র প্রদীপ্ত জেহাদ শুনে আমরা সচকিত হই, কিন্তু প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর কাজ যে আগেও কেউ-কেউ করেছিলেন, সিরাজীর "অনল-প্রবাহ" প্রকাশিত হওয়ায় তা চাক্ষুষ হল। বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার দিন তো পড়েই আছে। পরবর্তী সংস্করণে ড. কর এ বিষয়ে মনোযোগ দিলে শুধু তথ্যমূল্য নয়, বিশ্লেষণমূল্যেও গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

কবি ও কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বিষয়ে পাঁচটি বিশেষ আলোচনা ও তাঁর ১২টি কবিতা নিয়ে ১২টি কবিতা-আলোচনা-সংবলিত একটি প্রবন্ধসংকলনগ্রন্থ ("কবি ও কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত") সম্প্রতি হুগলী থেকে শীতল চৌধুরী ও অনুরাধা মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'শতবর্ষের আলোয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতি আলোকপাত করাই আমাদের এ সংকলনের উদ্দেশ্য।' এই তাৎপর্যহীন জবাবদিহিটা না করলেও চলত (সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৮২, বইটির প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ১৯৯০)।

বিশেষ আলোচনা পর্যায়ে "সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় প্রকৃতি" নিয়ে লিখেছেন শকুন্তলা দেবী, পুরাণপ্রতিমা নিয়ে তরুণ মুখোপাধ্যায়, স্বদেশচেতনা নিয়ে দেবকুমার ঘোষ, ছন্দ নিয়ে অলোক রায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথের পুনর্বিচার করেছেন তরুণ সান্যাল। অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা

বোধহয় জরুরি ছিল। শকুন্তলা দেবীর প্রবন্ধটি বুদ্ধদেব বসু-সুলভ কিছু আলট্রা বক্তব্য সত্ত্বেও রচনা-গুণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে হওয়া থেকে আমরা জানতে পারি সত্যেন্দ্রনাথ 'স্মরণীয় গদ্যলেখক হতে পারতেন কিন্তু হন নি' (পৃ ২০)। রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এইভাবে সচেতন করে দেবার কেউ থাকলে তিনি হয়তো ঠেকাতে পারতেন সত্যেন্দ্রনাথের এই বিপথ-গমন। আধুনিক বাঙলা গদ্য যে এক অর্থে কবিদেরই তৈরি—এ সত্য এড়াবে কে? নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ছে 'কবি, গদ্যের সভায় যেতে চাও, যাও।' যার শেষ পঙক্তিটি এইরকম 'লোকে যেন বলে / আসবার ছিল না কথা, তথাপি সম্রাট এসেছেন।' "পুরাণপ্রতিমার রূপকার কবি সত্যেন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে তরুণ মুখোপাধ্যায় পুরাণের মৌলসূত্রটির সন্ধানে আর. সি. হাজরা বা সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে না গিয়ে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর মনগড়া ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হয়েছেন। এতে গোড়ার দিকটা দুর্বল হয়ে গেছে—এরকম মনে করার কারণ আছে। পুরাণ প্রিজমের মতো বহুতলিক। মাইকেল আর গিরিশ ঘোষ—দুজনের কাছে পুরাণ এসেছিল দুরকম তাৎপর্য নিয়ে, অক্ষয় দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" অন্য বই—পুরাণ-চেতনার আকরগ্রন্থ নয়। অলোক রায়ের "পয়ার সে বর্জনীয়, বরণীয় ছন্দে বিচিত্রতা" প্রবন্ধটি আমার মতে অসামান্য। ছান্দসিক ও কবি—সূত্রকার ও প্রয়োগকর্তা এই দুজনকে একই প্রবন্ধে এরকম স্বাচ্ছন্দ্যে মেলানো সহজ নয়। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তা ও ছন্দচর্চা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে এ প্রবন্ধ সম্ভব ছিল না। অলোক রায়ের আলোচনার গভীরতায় আকৃষ্ট হয়ে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। সত্যেন দত্তের মন্দাক্রান্তা ছন্দ নিয়ে নানা অভিমত সত্ত্বেও আমার কেমন যেন মনে হয়—৮+৭+৭+৫-এর গাণিতিক ঠাটটার দিকেই আলোচকদের নজর আটকে আছে। স্বরপ্রসারক মাত্রাবৃত্তের (প্রত্যুদ্ধনি-প্রধান) স্বরকে টেনে উচ্চারণ করার অন্তঃস্থ স্বভাবটিকে কি এখানে গোপনে কাজে লাগানো হয় নি? ৮+৭+৭+৫-এর ঠাট ভেঙে সত্যেন দত্ত যদি লিখতেন—

জনকতনয়া / সিনানে স্নিগ্ধ / তটিনী যেখানে /
উচ্ছ্বাসে। স্নিগ্ধ তরু ছাওয়া / এ সেই রামগিরি / এখানে
যক্ষ / প্রবাসিত॥ কি বলা যেত? তরুণ সান্যালের
"কবি সত্যেন্দ্রনাথ : পুনর্বিচার" প্রবন্ধটিকে আমি
সত্যেন্দ্রনাথচর্চায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে মনে
করি। খোড়বড়িখাড়া আর খাড়াবড়িখোড় জাতীয়
সত্যেন্দ্রনাথ আলোচনার একঘেয়েমি থেকে সম্পূর্ণ
মুক্ত এই প্রবন্ধটি আধুনিক ও বহুমুখী এক কবি
সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়।

কবিতা আলোচনা পর্যায়ে পরিশ্রমী ও উত্তীর্ণ লেখা কম। কিশলয়সুলভ সাদা মনে রই করে তোলার জন্য নিশ্চয়ই এ সংকলন নয়। আলোচ্য কবিতার নির্বাচনে একটু সচেতনতার পরিচয় দিলে সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রবন্ধকার—উভয়ের প্রতিই সুবিচার করা যেত। 'জাতির পাঁতি' (সুজিৎ ঘোষ), 'শূদ্র' (প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য), 'সাগরতর্পণ' (মালতী ঘোষ), 'সেবাদাস' (অনুরাধা মিত্র) 'পদ্মার প্রতি' (উমা ভট্টাচার্য) জাতীয় কবিতার আলোচনায় নেমে কীই বা করা যেত।

এরই মধ্যে ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (যক্ষের নিবেদন), মঞ্জুভাষ মিত্র (সিংহল) অমরেন্দ্র গণাই (গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি) শ্যামলকুমার ঘোষ (দূরের পাল্লা), মৃন্ময় চক্রবর্তী (কবর-ই নূর-জাহান) প্রমুখ সম্ভবপর পরিশ্রম ও বিশ্লেষণের ছাপ রাখতে পেরেছেন। তবে অধিকাংশ লেখকেরই বক্তব্য 'যে সম্ভাবনা নিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছিল তা অপূর্ণ রয়ে গেছে। মঞ্জুভাষ মিত্র সিংহল কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'সিন্ধুর টিপ / সিংহল দ্বীপ / কাঞ্চনময় / দেশ'-একে স্বরবৃত্ত ছন্দে বিশ্লেষণ করতে চাইলে 'সিন্ধুর' প্রভৃতি প্রতিটি পর্বের প্রথম শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ করতে হবে' (পৃ ৯৩)—বলে যে রায় দিয়েছেন তা ঠিক নয়। কোনো দরকার নেই প্রথম শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ করার। স্বরবৃত্ত ছন্দে সংকোচন ও প্রসারণের যে নমনীয়তা-গুণ বর্তমান সেই অনুসারে একটি পর্বে পর-পর তিনটি হলন্ত অক্ষর থাকলে তার মাত্রা-সংখ্যা তিন না ধরে চার ধরতে হয়। উদাহরণ—'দণ্ডক বন / আছে কোথায় / ওই মাঠে কোন / দিক' (রবীন্দ্রনাথ); প্রথম পর্বটি পড়ার সময় আমরা কি প্রথম শব্দটির স্বরান্ত উদাহরণ করি? কেন তিন মাত্রা না ধরে চার মাত্রা ধরতে হয় এর উত্তর সত্যেন্দ্রনাথ দিতে পারতেন কিন্তু বাঘা-বাঘা ছান্দসিকেরা তাকে উপেক্ষা করে গেছেন বলে আমিও নীরব থাকলাম। সম্পাদক শীতল চৌধুরী 'চম্পা' কবিতাটির বিচারের ভার নিজের হাতে রেখেছেন—খানিকটা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বণ্টনের মতোই। দায়সারা গোছের একটি কবিজীবনী ও মূল্যবান কিন্তু অসম্পূর্ণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়ক আলোচনা পত্রিকাপঞ্জি (সন্দীপ দত্ত)ও এতে আছে। লেখক-পরিচিতি অংশটি পড়ে আমার কেন যেন মনে হল ইউ. জি. সি-কে এক কপি "কবি ও কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" পাঠালে মন্দ হত না।

বাঙলা কবিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘূর্ণিস্রোত

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বাঙলা কবিতায় ইদানীং একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কবিতা যেমন প্রচুর লেখা হচ্ছে, রঙিন মাছের ঝাঁকের মতো নবীন কবিরা আত্মপ্রকাশ করছেন, তেমনই প্রকরণভঙ্গি আর বিষয় নিয়ে চলছে নানা ধরনের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে-কোনো একটি বিশেষ শিল্পমাধ্যম নিয়ে ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনিবার্য ফল হল একটি নতুন যুগের সূত্রপাত। প্রবহমান স্রোত গতানুগতিক রেখায় চলতে-চলতে যখন হঠাৎ বাঁক নেয়, তখনই সৃষ্টি হয় আরেকটি নতুন প্রবাহের, যেটিকে, হয়তো বা রবীন্দ্রনাথের অনুসরণেই, আমরা আধুনিক যুগের চিত্রকল্পে ভাবতে পারি। রবীন্দ্রনাথের পর কল্লোলীয়রা চালু করেছিলেন বাঙলা কবিতার এক ধারা—যাকে তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন আধুনিক। আবার সেই আধুনিকতা যখন ক্রমে তার জৌলুশ আর প্রাসঙ্গিকতা হারাল, তখন পঞ্চাশের কবিদের হাতে আবার যেন নতুন করে মুক্তি ঘটল কবিতার। এঁরা আনলেন উজ্জীবিত প্রাণ আর ফুর্তির জোয়ার। কিন্তু পঞ্চাশের কবিরাও যে মূলত ভঙ্গিসর্বস্ব ও প্রচারপ্রবণ, তা এতদিনে বাঙলা কবিতার পাঠকদের কাছে প্রমাণিত। পরবর্তী এবং বর্তমান

বাঙলা কবিতা রমেন্দ্রকুমার থেকে প্রবুদ্ধকুমার—জমিল সৈয়দ সম্পাদিত। এ মাসের কবিতা : পি ২০৭, মতিলাল কলোনি, এয়ারপোর্ট ২নং গেট, কলকাতা-৮১। তিরিশ টাকা। **মরুভূমির গোলাপ**—সুবোধ সরকার। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর। পনেরো টাকা। **সহজ করো বাংলাভাষা**—সুব্রত সরকার। এ মাসের কবিতা। দশ টাকা। **পয়ার জীবন**—অঞ্জলি দাশ। এ মাসের কবিতা। দশ টাকা। **নিরুক্ত বর্ণ**—সৈয়দ সমিদুল আলম। আপেক্ষিক, ৬৫/৬ বাজে শিবপুর রোড হাওড়া-২। আট টাকা। **প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে**—অশোক রঞ্জন। ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা, ১০০০। কুড়ি টাকা। **নিহত ও বাজেয়াপ্তের তালিকা**—দানেশ আলম চৌধুরী। ওলিম্পিয়া হাউস, ১৮ গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু, কলকাতা-১৩। দশ টাকা। **এই গঙ্গা ক'জনের আছে**—উত্থানপদ বিজলী। কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। বারো টাকা। **আঁধার আলোকলতা**—দীপংকর রায়। শিল্পনিকেতন পাবলিকেশন, ১২৪ নিউ টালিগঞ্জ, কলকাতা-৯৩। বারো টাকা। **শব্দ আমার অগ্নিলতা**—দেবাশিস সাহা। দিগন্ত বলয়, ৫৪ শরৎ বসু রোড, কলকাতা-৮১। বারো টাকা॥

প্রজন্মের কবিরা কবিতার শরীরকে ভেঙে আবার দিতে চাইছেন নতুন রূপ, মনোযোগী হচ্ছেন বিচিত্র সব বিষয়ভাবনায়। নানা ধরনের কবিতা লেখা হচ্ছে এখন। বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্নপ্রকারে উৎসর্জন ঘটাতে চাইছেন কবিতার। কেউ চাইছেন কবিতার ভাষা থেকে সব জটিলতা বর্জিত হোক, চালু হোক—সরল, সহজ এবং শ্রেষ্যাত্মক নাগরিক এক ভাষা। কেউ বিষয়ভাবনায় কবিতাকে করে তুলতে চাইছেন দার্শনিক, সংহত এবং আবেদনমুখর। আবার কেউ-কেউ বস্তুপৃথিবীর ধাতব কর্কশতাকে এড়িয়ে গিয়ে স্বপ্ন আর কল্পনার এক তরল এবং পরাবাস্তব পাতালে আশ্রয় নিতে চাইছেন। একই সঙ্গে এত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘূর্ণিস্রোত বোধহয় বাঙলা কবিতাকে এর আগে আলোড়িত করে নি। আমাদের এই আলোচনায় বিশদভাবে পাঠক তার প্রমাণ পেতে পারেন।

জমিল সৈয়দ-সম্পাদিত "বাংলা কবিতা রমেন্দ্র-কুমার থেকে প্রবুদ্ধসুন্দর" নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে একটি উজ্জ্বল সংকলন। মোট ২৮ জন কবি জায়গা পেয়েছেন এখানে। সর্বজ্যেষ্ঠ কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর জন্মতারিখ ১৯২২। এবং সর্বকনিষ্ঠ কবি প্রবুদ্ধসুন্দর করের জন্ম ১৯৬৯-এ। একরাশ বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে এই গ্রন্থটি। কেননা, ১৯২০ থেকে ১৯৭০—এই পঞ্চাশ বছর সময়সীমাকে চিহ্নিত করে একটি এ ধরনের কবিতাসংকলন প্রকাশ করতে হলে যেসব প্রতিষ্ঠিত কবির অন্তরভুক্তি একেবারে অনিবার্য, এই গ্রন্থটিতে অতি আশ্চর্যভাবে তাঁরা অনুপস্থিত। তবে সব ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে সম্পাদক-লিখিত উৎকৃষ্ট ও আলোকদীপ্ত ভূমিকাটি পড়ার পর। 'প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমমুক্তি পেতে চেয়ে যে স্বপ্নের ও কবিতার দ্বারস্থ হয়েছি, তার সঙ্গে ঐ স্থূল, অনভিপ্রেত পৃথিবীর কোনো ঋণসম্পর্ক নেই।' —আমাদের জানান সম্পাদক। এবং—'আমাদের এই সংকলন এক বৃহৎ জগৎ ও তার নক্ষত্রসভার দিকে টেলিস্কোপের নল ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজটুকু করতে চায়।' এরকম প্রাঞ্জল এক মন্তব্য থেকে বিশেষ এক শ্রেণীর কবিদের নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা অবহিত হই। উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আছেন (উপরে উল্লিখিত প্রথম ও শেষ কবি ছাড়া,) মণীন্দ্র গুপ্ত, রঞ্জিত সিংহ, উৎপল-কুমার বসু, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, অরুণেশ ঘোষ, রমা ঘোষ, জমিল সৈয়দ, সুব্রত সরকার, অঞ্জলি দাশ, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রভানু সরকার ও আরও অনেক তরুণ কবি। প্রত্যেকেই ভালো কবিতা লিখেছেন। কারো কবিতায় উঁকি দেয় 'উলঙ্গ সৌন্দর্য', কারো 'ভাষা থেকে লাফিয়ে নামিয়ে চাঁদ', আবার কেউ আমাদের উপহার দেন 'ঘুমন্ত তরুণী-মায়ের ছড়ানো পায়ের ফাঁকে ময়ূরভঙ্গের লাল ঘোড়া'—এরকম অভিনব চিত্রকল্প। তরুণ কবিরা তাঁদের ভাষাচর্চা আর কল্পনাধ্যানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করতে চাইছেন এক নতুন ঐতিহ্য। অনেকের চিত্রকল্প, ছবি বা শব্দপ্রয়োগে বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। যেমন : (ক) 'বাঁশগাছের নীচে সারারাত হরিণ / সারারাত গন্ধর্ব', (খ) 'বিকেল ৫-৩৫ মিনিটে কমলা-লেবুকে একটিপে ছুঁড়ে দিতেই, হাঁ মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিকলাঙ্গ ব্যাঙ।', (গ) 'আমি যে কীসের লোভে ঘুম যাই, অন্ধকার রেলপথ জানে।' তবে সম্পাদকের একটি মন্তব্যকে আমরা মেনে নিতে পারি না। 'সাম্প্রতিক লেখালেখির জগতে যে বিপুল শূন্যতা-পরিক্রমণ, দূরমার্গগামিতা ও কল্পনানিমিতি, তা রমেন্দ্রকুমারের কাছ থেকেও পাওয়া।' তাই কি? তাহলে জীবনানন্দের কাছ থেকে আমরা কী পেলাম? পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও সুন্দর প্রকাশনার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ গ্রন্থটি।

সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে কবিতা লিখছেন সুবোধ সরকার। আবির্ভাব থেকেই নিজস্ব কণ্ঠস্বর নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র। পরিশীলিত মেধা, বৈদগ্ধ্য, ক্ষুরধার ব্যঙ্গ এবং নিপুণ ছন্দবোধ—এসবই তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। বিষয়বৈচিত্র্যে বাঙলা কবিতার প্রলম্ব প্রগতি সুবোধের কবিতা পড়লে আমরা বুঝতে পারি। তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ "মরুভূমির গোলাপ"। এই গ্রন্থে প্রধানত অ্যানটি-পোয়েট্রি বা কবিতা-বিরোধী কবিতার চর্চা করেছেন তিনি। শ্রীরাম মন্দির, বেশ্যা, ধর্মের ষাঁড়, মন্ত্রী, প্রশাসন, কালীপুজো, পরস্ত্রী, প্রাক্তন স্বামীর ট্রাউজার—এরকম যে-কোনো বিষয়ই সুবোধের কবিতায় স্থান পেতে পারে। ম্যাথু আর্নলডের অনুসরণে কবিতাকে যদি আমরা সমাজের সমালোচনা বলে মেনে নিই, তাহলে সুবোধের কবিতা হল এই বক্তব্যের আধুনিক সমর্থন। যে শহর এবং সমাজে আমরা বেঁচে আছি, তা হল নরকেরই এক প্রতিচ্ছবি—এই গ্রন্থের কবিতাগুলি পড়লে এরকম মনে হতে পারে আমাদের। তবে সবকিছু ছাপিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে তাঁর স্যাটায়ারিক টোন। যেমন—(ক) 'মাছগুলা কবিতা পড়ে না / মধুবিক্রেতাও কবিতা পড়ে না। / মুমূর্ষু কিশোর, ভাই তুমিও প'ড়ো না / জ্যোতিবাবু কবিতা পড়ে না।' (খ) 'চাবুক থাকে দেয়ালে / বাইরে আছে কামান / যেভাবে হোক এখুনি / আদবানিকে থামান।' (গ) 'কলকাতা ঘুরে যান নিকানোর পায়রা / তিনি আরো এক-ধাপ এগিয়ে এলেন / ফ্রয়েডের শ্রাদ্ধ করে হেসে বললেন / তাহলে মাও-সে-তুঙ যৌন প্রতীক।' ব্যঙ্গের কাঁটাচাবুক আমাদের পিঠকে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত করে যখন 'ধউ কিরকম হবে' কবিতায় সুবোধ লেখেন—'বোতল ফাটিয়ে / হাতঘড়ি বেচে / পুলিশ বন্ধুর জিপে বাড়ি ফিরে আসি। / কিন্তু বাড়ি ফিরে যেন আলপনা দেখি / যেন দেখি / বউ ভাত বেড়ে একা বিয়ের রাতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।' নীতিহীন, স্বপ্নহীন, প্রেমহীন, আদর্শহীন আমাদের এই অস্তিত্বের আধুনিক প্রকাশ-মাধ্যম বোধহয় সুবোধের কবিতা। তিনি তৈরি করে নিতে চাইছেন এমন এক সাংকেতিক ভাষা যা সংস্কার-অনুসারী কবিতা-ভাষার বিরোধী : 'মেয়ে দুটি আমাকে নগ্ন করে হেসে ওঠে : /'এই যে পদ্মচিহ্ন, ঢোকা এইখানে'/ এই বাক্যটুকু শুনে আমার শরীরে একে একে দেখা দিল/কাস্তে হাতুড়ি চাকা সাইকেল রিকশ দাঁড়পাল্লা নির্দলের টর্চলাইট পর্যন্ত'। তবে জনপ্রিয় কবিতা লেখার দিকে সুবোধের এক বিপজ্জনক ঝোঁক লক্ষ করছি ইদানীং। কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়া কৃষ্ণেন্দু চাকীর প্রচ্ছদে গ্রন্থটি আকর্ষণীয়।

কবিতার ভাষা নিয়ে বেপরোয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সুব্রত সরকার তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে; যার নামকরণেই প্রকাশ পায় উদ্যত এক চ্যালেঞ্জ—'সহ্য করো, বাংলাভাষা'। এলোমেলো জীবনযাপনকে এলোমেলো এক ভাষায় বর্ণনা করার নিপুণ দক্ষতা আছে সুব্রতর। এই গ্রন্থে তাঁর কবিতার আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। রোমানটিকতা সম্বন্ধে একটি সময়জীর্ণ সংজ্ঞা প্রচলিত আছে—'strange-ness added to beauty'। সৌন্দর্যের সঙ্গে অনির্বচনীয়ের সংযোজনে সৃষ্টি হয় এক মায়াবিভ্রম। রোমানটিকতার এই ধারণা যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে সুব্রতর কবিতাকে বলা যেতে পারে—নিও-রোমানটিক কবিতা। নিজের বিমূর্ত কল্পনা দিয়ে সুব্রত পরিচিত নিসর্গকে জীবন্ত, অপরূপ ও মায়াবী করে তুলতে পারেন তাঁর কবিতায়। অবচেতনার গভীর অন্ধকার থেকে উঠে আসে একের পর এক—'মায়া সরোবর, পাতালপুরীর নিঝুম অট্টালিকা কুয়াশামাখা নিদ্রার জগৎ।' প্রকৃতির এক প্রাণবন্ত ছবির একটি উদাহরণ : 'ভোরের প্রাকমুহূর্তে / বনের ভিতরে এক ধরনের উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, প্রত্যূষের। প্রথম উষাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে / কোনো কোনো গাছের গায়ে পরিষ্কার স্তন দেখা দেয়।' জীবনের এত অপূর্ব, চিত্র-রূপময় ও প্রতীকী ব্যাখ্যা আমরা খুব বেশি পেয়েছি কি?—'কত জিজ্ঞাসার সবুজ পাতা দিয়ে ঘেরা লোকের জীবন / একটির উত্তর জানতে পারা মানে একটি ফুলের সৃষ্টি।' চমৎকার সব উপমা, অভিনব সব

চিত্রকল্পের ভিড় তাঁর কবিতায়। যেমন: 'ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে দুঃখের ঠাকুরকে দেখা যায় হাসছেন।' কিংবা, 'ব্রহ্মজ্ঞানের মতো সম্পন্ন গ্রাম ছিলো'। বাঙলা কবিতার পরিচিত ভাষাবিন্যাসকে ভেঙে, গুঁড়িয়ে, স্বত্রত তৈরি করে নিতে চাইছেন নিজের এক ভাষা যা হয়তো একবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত কাব্যভাষা। পাঠকের অবগতির জন্যে একটি ছোটো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—'এখানে কীট ও মহত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে মিশে এমন মায়ার সৃষ্টি করেছে যে তাকে বলা হয় "সভ্যতার অর্থ-সন্ধট"। সুতরাং সত্য প্রকাশের আগে জল বাষ্প হয়ে উবে যাবে কিনা এ গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না।' বেশি কথা বলার আবেগ বা ঝোঁকে সংযত করে নিতে পারলে স্বত্রত কবিতায় বরিস বেকার হতে পারবেন—এরকম আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থটির মুদ্রণ-পরিকল্পনা ও বিমূর্ত প্রচ্ছদে বেশ চমৎকারিত্ব আছে।

কবিতা হবে শব্দের রূপময় ভাস্কর্য—মেধা আর কল্পনার বিক্রিয়ায় এক সচেতন নির্মাণ—এরকম এক বিশ্বাস থেকেই মনে হয় কবিতা রচনা করেন অঞ্জলি দাশ। তুলনামূলকভাবে অন্য অনেকের থেকেই কম লেখেন অঞ্জলি। কিন্তু যা লেখেন যত্ন নিয়ে লেখেন। নিজের অবচেতনে অবগাহন করে লেখেন। তাঁর "পরীর জীবন" একটি বেশ ভালো কাব্যগ্রন্থ। অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি একটানা পড়তে-পড়তে পাঠকের সামনে যেন এক অপার্থিব, মায়াপৃথিবীর উন্মোচন হয়। বিমূর্ত কল্পনা অঞ্জলির চিত্রল কবিতাকে দালি বা ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্তের ছবির সমগোত্রী করে তোলে: 'সন্ধেয়, রূপোর খড়ম ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে/ দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে মেয়ে আজ বয়স বাড়ালো/ আর তার সারা গায়ে তারাগুচ্ছ জ্বলে'। শব্দের নিপুণ প্রয়োগে তিনি সৃষ্টি করতে চান এক আধুনিক রূপকথা যা হয়তো আগামী প্রজন্মের কাছে পেতে পারে "ঠাকুরমার ঝুলি"-র সম্মান। ছবিতে এবং আভাসে কথা বলা আয়ত্ত করেছেন বলেই অঞ্জলির হাতে সঙ্গমের বর্ণনাও হয়ে ওঠে এত নান্দনিক—'ভিতরে শুয়ে আছে ঝিনুকের ফুল / ভিতরে ছড়ানো আছে শঙ্খের গান / বেজে ওঠার আগে ডেকে নিলেন সমুদ্র-পুরুষ / "আমার প্লাবন চাই, মৃত্যুর চেয়েও দ্রুত"।' আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ গ্রন্থটিকে অত্যন্ত শোভন করে তুলেছে।

'এই পৃথিবীর প্রথম কবিতা আগুন / এই পৃথিবীর শেষ কবিতাও আগুন'—পড়ে চমকে উঠতে হয়! কী গভীর বোধ আর প্রজ্ঞার প্রকাশ এই লাইন দুটিতে! তরুণ কবি সৈয়দ সমিহুল আলমের "নিরুক্ত বর্ণ" কাব্যগ্রন্থের ২৭টি কবিতায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার প্রমাণ আছে। খুব সাম্প্রতিক কবিদের লেখা পড়লে আমাদের মনে হয় যে, তাঁরা প্রায় সকলেই কবিতার টেকনিক নিয়ে বড়ো বেশি চিন্তিত। জীবন আর পৃথিবী নিয়ে নিজের উপলব্ধিকে যে এখনও সহজভাবে কবিতায় প্রকাশ করা যায়, তার উজ্জ্বল উদাহরণ সৈয়দের কবিতা। তিনি যেন কবিতায় প্রকৃতই একজন দ্রষ্টার ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাঁর উচ্চারণে অতি-আবেগ কিংবা অকারণ উচ্ছ্বাস নেই। প্রতিটি কবিতার আকার সংক্ষিপ্ত, আবেগ সেখানে অতি-সংহত, প্রজ্ঞা সেখানে ফুলের মতো পাপড়ি মেলে থাকে। ঠিক বলতে হলে সৈয়দের কবিতাকে 'logical exposition of meta-physical ideas' বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'মানুষের অস্তিত্ব শূন্যতার নীলে ঢাকা/ কেননা, সারা পৃথিবীটাই শূন্য, নীল'। (খ) 'সমুদ্র নিরাকার। মানুষের আত্মা-ও নিরাকার। / তাই, মানুষের সমুদ্র আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়'। এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা আমাদের মতে 'গোলাপ'; যার কিছুটা উদ্ধৃত করার প্রলোভন সামলাতে পারছি না: 'নারীর রহস্য আজো অনাবিষ্কৃত / নরম শরীরে তার আমি দেখি সজীব গোলাপ / এই গোলাপের রঙ নীল / নারীর রহস্য-ও নীল'। ভঙ্গিপ্রধান কবিতা পড়তে-পড়তে ক্লান্ত আমরা সৈয়দের কবিতায় পেতে পারি পরিতৃপ্তির একঝলক হাওয়া।

অশোকরঞ্জনের "প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে" গ্রন্থটি পরিকল্পনায় বেশ নতুন। দুটি দীর্ঘ কবিতা আছে এখানে। দীর্ঘ কবিতা আজকাল তো তেমন চোখেই পড়ে না। অশোকরঞ্জনের ভাষায় তাঁর গ্রন্থটি 'দুটি উপন্যাসাশ্রয়ী কবিতার সংকলন'। প্রথম কবিতা 'গতকাল' মনে হল কবির বিচিত্র আত্মজীবনী। একের পর এক অভিজ্ঞতা, একের পর এক চরিত্রের সমাবেশ এই কবিতায়। তাঁর আছে এক নিজস্ব ডিকশন আর বর্ণনার টেকনিক। এ দুয়ের সাহায্যে তিনি কবিতায় গল্প কিংবা উপন্যাস লেখেন। প্রায় গদ্যের কাছাকাছি তাঁর ভাষা, অথচ তা পুরোপুরি গদ্য নয়। যেমন: 'সোনাবৌদি' নামে পরিচিত ছিলেন অনিদার বৌ / সোনার মত ঔজ্জ্বল্য তার শরীরে দেখিনি, / তবু তাকে 'সোনাবৌদি' কেন—প্রশ্ন তোলার সুযোগই হল না—'। এক 'মহাজীবনের' আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে কবিতাটি শেষ হয়। দ্বিতীয় কবিতায় তিনি এক রমণীর ভালোবাসা ও প্রতারণার গল্প শোনান। লেখার অখণ্ডতি এবং ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য পাঠককে কখনোই ক্লান্ত করে না। এই কবিতার শেষে আছে ব্যক্তিগত যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত: 'তোমাকে না ভুলেই, ভুলতে চাই না বলে / আপন করে নেব পৃথিবীকে / মানুষকে কাছে টেনে নেব আরো'। দীর্ঘ কবিতার আঙ্গিক নিয়ে অশোকরঞ্জনের এই সাহসী পরীক্ষা নিশ্চয়ই পাঠকের অনুমোদন পাবে।

দানেশ আলম চৌধুরী একজন সমাজসচেতন কবি। একটু উঁচু গলায়, রাগি ভঙ্গিতে কথা বলতে পছন্দ করেন তিনি। "নিহত ও বাজেয়াপ্তের তালিকা" গ্রন্থটির কবিতাগুলির বিষয় সমাজের নানা জটিল বৈষম্য। নিরন্ন মানুষের যন্ত্রণা আর আর্তি প্রকাশ পায় তাঁর কবিতায়। তাঁর সহজ প্রার্থনা: 'ছোট্ট একটা কুপি জ্বলুক, / ভাঙা হাঁড়িতে কটা চাল ফুটুক···।' কোনো-কোনো কবিতায় তীব্র শ্লেষ প্রকাশ পায়: 'প্রায় সব সম্রাটেরাই জিভ কাটার কসাই।/ সোনার ইতিহাসে নাম লেখানোর লাইনে / প্রতিযোগীরা—সবাই কিন্তু সম্রাট···।' যেসব পাঠক রাজনৈতিক চেতনার কবিতা খোঁজেন, এই কবির কবিতা তাঁদের ভালো লাগতে পারে।

উত্থানপদ বিজলীর আছে 'টগবগে আবেগ', কিন্তু বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করার পরও নিজস্ব এক ডিকশন তিনি এখনও খুঁজে নিতে পারেন নি। ফলত, তাঁর "এই গল্প কজনের আছে" গ্রন্থের কোনো কবিতাই পাঠকের কাছে তেমন আবেদনমুখর হয়ে উঠতে পারে না। তবে বেশ রোমানটিক এক মন আছে এই কবির। আছে—নির্ভেজাল নিসর্গপ্রীতি। কোনো-কোনো কবিতায় তিনি বেশ সরল ভাষায় প্যাস্টোরাল ছবি আঁকতে পারেন: 'তুমি কি গিয়েছ হেঁটে সুদূরের পথ ধরে দিগন্ত অবধি / দশটা আঙুল ছুঁয়ে অকপট খেলা করে নিভৃত বাতাস'। কিংবা—'আমার স্বপ্নের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে নদী / একটি সোনালী মাঠ শস্যে ভরে আছে'। গ্রন্থটির প্রচ্ছদে বহতা গঙ্গার ইঙ্গিত বেশ ভালো।

ভুল ছন্দে, অপরিশীলিত আবেগে এবং অপ্রচলিত এক ভাষায় একের পর এক পদ্য রচনা করেছেন দীপংকর রায় "আঁধার আলোকলতা" গ্রন্থে। মনে হয়, তিনি সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে খোঁজখবর কিছুই রাখেন না। 'যতক্ষণ আছি এই পৃথিবীর ভাঁজে ডিগবাজি/ জলকলা অন্তঃসার বিপরীতপক্ষ'; কিংবা, '···আজ ওরা কেউ নেই। / দিগন্তজোড়া দু'ফালি বাঁশ।' —এইসব হাস্যকর লাইনের অর্থ কী?

দেবাশিস সাহা কবিতা খুব একটা খারাপ লেখেন না।

কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতার কাছে পৌঁছতে হলে তাঁকে এখনও অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তাঁর "শব্দ আমার অগ্নিলতা" গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতারই বিষয়-বস্তু প্রেম বা প্রেমের উচ্ছ্বাস। 'আমি জানিনা / কোন্ পথে তুমি আসবে / সমস্ত পথেই তাই জ্বালিয়েছি দীপশিখা'—একজন তরুণতম কবি এরকম স্টাইলে আজকাল কবিতা লেখেন না—এটা দেবাশিসের মনে রাখা উচিত। তবে তাঁর ভাবনারগভীরতা আছে বলেই তিনি লিখতে পারেন : 'সারারাত কী কষ্টে পাপড়ি মেললো / গোলাপ / তুমি জানলেই না!' বেশি কথা বলবার প্রবণতা দেবাশিসের—অনেক কবিতাকেই নষ্ট করে। দেবাশিস,—আপনি চিত্রকল্প ও প্রতীকে কথা বলতে চেষ্টা করুন। শব্দ নিশ্চয়ই আপনার কবিতায় একদিন ব্রহ্ম হয়ে উঠবে।

জাতীয় বিপ্লবীর কর্মজীবন—কিছু নতুন তথ্য

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

আজ নতুন ধারার ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্বীকৃত মত এই যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, যা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে নানাস্থানে দীর্ঘকাল ধরে চলে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাহস্তান্তরে বাধ্য করায়, তার অনেক ধারা ছিল। এই নানাবিধ ধারার মধ্যে অহিংস গণ-আন্দোলন যেমন ছিল, তেমনি সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী পন্থাও ছিল, ছিল আরো বহু ধারা। কোনো বিশেষ দল, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা পরিবারের ভূমিকা মহান বলে যতই লক্ষঝম্ফ হোক না কেন—আধুনিক লেখকদের নব প্রচেষ্টার ফলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে

শহীদ কানাইলাল : নূতন তথ্যের আলোকে। বসন্তকুমার সামন্ত। সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬। পঞ্চাশ টাকা।

প্রত্যেক দলের, প্রত্যেক গোষ্ঠীর, নানা ব্যক্তির, নানা শ্রেণীর মানুষের ভূমিকাই আজ আলোচনার সামনে আনা হচ্ছে। সরকারি অপপ্রচার বা কেমব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অমূল্যায়ন তাকে খাটো করতে পারে নি। নিত্যনতুন প্রচেষ্টায় জাতীয় বিপ্লবীদের সম্বন্ধে লেখা বেরুচ্ছে বলে বর্তমান যুবসমাজের একাংশ পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধ অথচ সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করতে শিখছে। ড. বসন্ত-কুমার সামন্ত -লিখিত শহীদ কানাইলাল-বিষয়ক বইটি এই নব উদ্যমে চর্চার এক উৎকৃষ্ট ফসল বলা যেতে পারে।

ভারতের মুক্তিযজ্ঞের ইতিহাসের এক আশ্চর্য চরিত্র কানাইলাল দত্ত। তাঁর নাম সর্বাধিক পরিচিত ঐতিহাসিক আলিপুর বোমার মামলার (১৯০৮-০৯) আসামি, শহিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৮২-১৯০৮) ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে। বিশেষত ওই মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে ইংরেজ সরকারের জেল-হাসপাতালে হোমহর্ষকভাবে হত্যার জন্য সত্যেন-কানাইলাল একত্রে শহিদ হন; আজো তাঁরা একত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। দুজনেই অকালমৃত, কবির ভাষায় 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে', তবে মৃত না বলে বলা উচিত দুজনকেই মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সাম্রাজ্যবাদী সরকার বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে ফাঁসিতে প্রাণদণ্ড দেয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অগস্ট হুগলী জেলার চন্দননগরে জন্ম কানাইলালের। পিতা চুনিলাল দত্ত কলকাতার মেরিন অ্যাকাউনটস অফিসে কাজ করতেন। বিভিন্ন সূত্রে কানাইলালের জন্মতারিখ নিয়ে নানা মত থাকলেও, ড. সামন্ত প্রামাণিক দলিলের সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন (পৃ ৪-৫)। অল্প বয়সে কানাই, পিতার বোম্বাই বদলি হওয়ার ফলে, সেখানে গিয়ে শিক্ষার প্রথম পাঠ লাভ করেন। কানাই কত বছর বয়সে বোম্বাই যান তা নিয়ে বিপ্লবী মতিলাল রায় এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি-

চারণে কিংবা ব্রজবিহারী বর্মন, সুধীরকুমার মিত্র, পূর্ণ-চন্দ্র দে প্রমুখের পুস্তকে নানারকম কথা লেখা থাকলেও, এ ক্ষেত্রেও ড. সামন্ত পাঠক-পাঠিকাদের ভ্রান্তি-নিরসনে সাহায্য করেছেন। 'বোম্বাই প্রবাসজীবনে তাঁর কিশোর মনে মহারাষ্ট্রের সিংহশিশু চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় ও রানাডের আত্মদানের অসাধারণ কাহিনীর প্রভাব নিশ্চিত পড়েছিল'—জানিয়েছেন লেখক (পৃ ১১)। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে চুনিলাল আবার সপরিবারে চন্দননগরে ফিরে আসেন এবং কিশোর কানাইলাল চন্দননগর ছ্যাপ্লে কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় ও সান্নিধ্যে ছাত্র-সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক ভাবধারা সঞ্চারিত হয়েছিল আগেই, কানাইও অচিরেই এই পরিবেশে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। চারুচন্দ্র রায় (১৮৬৯-১৯৪৫) ও মতিলাল রায় (১৮৮৩-১৯৫৯) তাঁর গুরু। ফরাসি-শাসনাধীন চন্দননগরে প্রস্তুতি নিয়ে কানাইলাল স্বদেশী পর্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেন। ১৯০৬ খ্রী কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করে, কিছুদিন চাকরি করে, হুগলী কলেজে বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। অন্যদিকে ক্রমে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিলেন। তারপর ক্রমে "যুগান্তর" বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ড ও কানাইলালের ভূমিকা, মানিকতলা (মুরারিপুকুর) বাগানে কার্যকলাপ, হুগলী কলেজে জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের প্রভাব, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষা দান, বিপ্লবী দলের সদস্যদের গ্রেফতার বরণ এবং আলিপুর বোমার মামলা যেমন সাধারণ শিক্ষিত সমাজে বহুল পরিমাণে জ্ঞাত, তেমনি বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্রনাথ গোঁসাইকে হত্যা করে সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্তের শহিদ হওয়ার কথাও। সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই বিপ্লবীদের জীবন কেড়ে নেয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর।

জাতীয় বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের কর্মজীবন নতুন তথ্যের আলোকে হাজির করতে চেয়েছেন লেখক এবং সে কাজে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে, পাঁচটি পরিশিষ্ট সহ একশো চুরাশি পৃষ্ঠায় সুমুদ্রিত গ্রন্থটি উপহার দিয়েছেন। এর মধ্যে চোদ্দ আনা তথ্যই নতুন নয়, অর্থাৎ শহিদ কানাইলালের যে একাধিক জীবনী ছাপা হয়েছিল বা বিপ্লবী আন্দোলনের যেসব ইতিহাস লেখা হয়েছে কিংবা ছাপার অক্ষরে প্রাপ্তব্য নানা জাতীয় বিপ্লবীর আত্মকথনের মধ্যে আমাদের সে কথাগুলি জানা আছে। তৎসত্ত্বেও বসন্তবাবুর কৃতিত্ব বিন্দুমাত্র খাটো করছি না। একদিকে যেমন পুরনো তথ্যগুলি তিনি প্রয়োজনমত যাচাই করে সংশোধন করছেন—যা মূল্যবান কাজ, তেমনি অন্যদিকে জীবনীগুলির অধিকাংশই এখন বাজারে পাওয়া সহজ নয়, তাই বসন্তবাবুর জীবনী-রচনার কাজ আরো মূল্যবান। তবে বইটির সর্বাধিক মূল্য যে দু আনা অংশে নতুন তথ্য আছে। কানাইলালের শেষ দু বছরের ছাত্রজীবন কিভাবে শেষ হয়? তিনি কি বি. এ. পাশ করেছিলেন ইতিহাসে অনার্স নিয়ে? তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী দিয়েছিল কি দেয় নি? অথবা ডিগ্রী দিয়েও সেটি কি কেড়ে নেওয়া হয়? ডিগ্রীটি কোথায় গেল? এইসব প্রশ্নের সমাধান শুধু তিনি করেছেন তাই নয়, বহু ভ্রান্ত ধারণার তিনি নিরসন করেছেন। প্রসঙ্গটি সামান্য বিস্তৃত করা দরকার।

প্রায় সমস্ত জীবন-কথা এবং স্মৃতিচারণে বলা হয়েছে যে কানাইলাল দত্ত হুগলী কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ স্নাতক হয়েছিলেন কিন্তু তখন তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর ডিগ্রী বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দেয় এবং তা কেড়ে নেওয়া হয়। বিপ্লবী মতিলাল রায় লেখেন : 'পরীক্ষায় কানাই উত্তীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু নরেন্দ্রনাথের হত্যাপরাধ প্রমাণ হইলে গভর্নমেণ্ট তাহার ডিগ্রী কাড়িয়া লয়।' যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কানাইলালের বি. এ. ডিগ্রী কেড়ে নেয়।' "মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই" গ্রন্থে সুধীরকুমার

মিত্র লেখেন, '১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কানাইলাল হুগলী কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষা দেন এবং ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যার জন্য তাঁহাকে ডিগ্রী দেওয়া হয় নাই।" এমনকী সম্প্রতি-প্রকাশিত "সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান" বা *Dictionary of National Biography*-র মতো বইতেও অনুরূপ মত প্রকাশিত। বসন্তকুমার সামন্ত অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন এই ধারণা ভুল এবং ভুলের গোড়া সমসাময়িক "সন্ধ্যা" পত্রিকায় (২২ সেপটেম্বর, ১৯০৮) একটি ভুল সংবাদ। বস্তুত ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়া শুরু করলেও অনার্স ছেড়ে দিয়েছিলেন, কানাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তাঁকে ডিগ্রী দেওয়া হয় কলেজ মারফত এবং তা কেড়ে নেওয়াও হয় নি। সরকারি নথিপত্রে প্রমাণাভাবে কানাইলালের ডিগ্রী যে 'বাজেয়াপ্ত' করা হয়নি সে-কথা নিশ্চিত হয়ে অনুসন্ধান করতে অগ্রসর হয়ে ড. সামন্ত শেষ পর্যন্ত হুগলী কলেজের পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে 'অবিতরিত' সতেরোটি অভিজ্ঞানপত্র খুঁজে পান, যার মধ্যে কানাইলাল দত্তের ডিগ্রীও ছিল। এজন্য বসন্তকুমার সমগ্র বাঙালি সমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল এক 'বিশেষ সমাবর্তন' উৎসবের ব্যবস্থা ক'রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কানাইলালকে ডিগ্রীতে বঞ্চিত করা হয়েছিল ধরে নিয়ে, নতুন ক'রে মরণোত্তর ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বসন্তকুমার সামন্তের আবিষ্কারের ফলে সেই অনুষ্ঠানে পুরনো আসল ডিগ্রী দেওয়াই সম্ভব হয়। খুবই আশ্চর্যের কথা, সে দিনের অনুষ্ঠানের নানা বক্তা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, তদানীন্তন রাজ্যপাল বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী—কারো বক্তৃতাতেই বসন্তকুমার সামন্তের কৃতিত্বের সামান্য উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (উপাচার্য) স্বাক্ষরিত ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মূল ডিগ্রীটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে ধরে নিয়ে নতুন করে ডিগ্রী দিলে একটা ভুল চিরকালের জন্য থেকে যেত। আশা করি বর্তমান প্রজন্মের কাছে বইটি স্বীকৃতি পাবে এবং প্রচারিত হবে।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি, কেইনস এবং কালেসকি

অমর ঘোষ

দেবপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের "কেইন্‌সের অর্থনীতি" নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস। কেইন্‌সের তত্ত্বকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য করে পৌঁছে দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। বইটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের প্রধান আলোচ্য বিষয় কেইন্‌সের তত্ত্ব। দ্বিতীয়াংশের মূল প্রতিপাদ্য কেইন্‌সের জীবন।

বইটির দ্বিতীয়াংশে লেখক কেইন্‌সের বর্ণময় ব্যক্তিত্ব এবং জীবনের একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষা সাবলীল, বর্ণনা রসগ্রাহী। কী ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে এবং ঘটনাপরম্পরায় তিনি অর্থনীতি সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন, তার কিছুটা আন্দাজ আমরা এখান থেকে পেয়ে যাই। এজন্যে আমরা লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের অসুবিধা হয় প্রধানত বইটির প্রথমাংশে। এই অংশে লেখক কেইন্‌সের তত্ত্বের বহু দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তার সামগ্রিক রূপটি যে খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে, তা বলা যায় না। তাঁর রচনার দুর্বলতাগুলিকে নির্দেশ করতে হলে খুব সংক্ষেপে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্ ও কেইন্‌সের জাতীয় আয় বা শ্রমনিয়োগতত্ত্বের মূল বক্তব্যগুলি বলে নেওয়া প্রয়োজন।

একটি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামগ্রিক উৎপাদনের মাত্রা কত হবে, এ সম্পর্কে কোনো ধারণায় পৌঁছতে হলে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার। প্রথমত, যে-কোনো দেশে (যেখানে অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ নেই এবং বৈদেশিক বাণিজ্য নামমাত্র) কোনো নির্দিষ্ট বছরে যে অর্থমূল্যের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয়, তার পুরোটাই দেশের লোকদের মধ্যে আয় (মজুরি, মুনাফা, সুদ ও খাজনা) হিসাবে বর্ণিত হয়। অর্থাৎ কোনো দেশে কোনো নির্দিষ্ট বছরে সামগ্রিক উৎপাদনের অর্থমূল্য যদি হয় ১০, তবে ওই বছরে ওই দেশের লোকদের সামগ্রিক আয়ও ১০।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি: ভোগের জন্য চাহিদা এবং বিনিয়োগের জন্য চাহিদা। ভবিষ্যতে আয়-বৃদ্ধি করতে সক্ষম, এমন দ্রব্যের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করার জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদাকে বলা হয় বিনিয়োগের জন্য চাহিদা। যেমন, কোনো উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি বা মজুত দ্রব্যে (inventory) পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা হল তার বিনিয়োগের জন্য চাহিদা। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য অন্য সব ধরনের চাহিদাই হল ভোগের জন্য চাহিদা।

তৃতীয়ত, সামগ্রিক আয় (১০) থেকে সামগ্রিক ভোগব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তা-ই সঞ্চয়।

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, যখন উৎপাদনের অর্থমূল্য (১০) বা আয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিকল্পিত ভোগব্যয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ-ব্যয়ের যোগফলের সমান হয়, তখন উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা আর যোগানের মধ্যে সমতা আসে। অথবা উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা আর যোগান তখনই সমান যখন পরিকল্পিত সঞ্চয় (=১০-পরিকল্পিত ভোগব্যয়) ও পরিকল্পিত বিনিয়োগব্যয় সমান।

ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব অনুযায়ী, পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগব্যয় সব সময়ই সমান। একেই আমরা Say's Law বলে থাকি। ক্ল্যাসিকাল অর্থ-নীতির এই সিদ্ধান্তটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয়। কারণ, সঞ্চয়ের বেশির ভাগটাই আসে পরিবার বা ব্যক্তির কাছ থেকে, কিন্তু বিনিয়োগ করে মূলত উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান। অতএব, এদের পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকাটাই স্বাভাবিক।

ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে এই দুই ধরনের সিদ্ধান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় সুদের হারের ওঠানামার মধ্যে দিয়ে। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মতে, সঞ্চয়-কারীরা সঞ্চয়কে ব্যবহার করে সুদ আয় করার জন্য। তারা তাদের সমস্ত সঞ্চয় ঋণ হিসাবে দিতে চায়। সেই কারণেই সঞ্চয়ের পরিমাণ সুদের হারের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং সুদের হার বাড়লে সঞ্চয়-কারীরা আরও বেশি সঞ্চয় করতে আগ্রহী হয়।

অন্যদিকে, বিনিয়োগকারীদের ঋণের প্রয়োজন হয় বিনিয়োগের জন্য। এবং সুদের হার যত কম হয়, বিনিয়োগকারীরা তত বেশি বিনিয়োগ করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হয়। অতএব, আমরা পরিকল্পিত সঞ্চয়কে ঋণের যোগান আর পরিকল্পিত বিনিয়োগব্যয়কে ঋণের চাহিদা বলে মনে করতে পারি। কোনো সুদের হারে সঞ্চয় বা ঋণের যোগান বিনিয়োগ বা ঋণের চাহিদার থেকে বেশি হলে সুদের হার কমে গিয়ে সঞ্চয় আর বিনিয়োগের মধ্যে সমতা নিয়ে আসে। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মতে, সুদের হারের ওঠা-নামা খুব তাড়াতাড়ি হয়, অতএব পরিকল্পিত সঞ্চয় আর পরিকল্পিত বিনিয়োগব্যয় কখনোই খুব বেশি সময়ের জন্য আলাদা থাকতে পারে না।

এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, উৎপাদন-কারীরা যে পরিমাণই উৎপাদন করুক না কেন, উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রি করতে তাদের

কেইন্‌সের অর্থনীতি—দেবপ্রসাদ সিংহ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩। পঁচিশ টাকা।

কোনো অসুবিধাই হবে না। এই অবস্থায় এটা সহজেই দেখানো যায় যে, উৎপাদনপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করার জন্য মূলধন ও শ্রমের সীমাবদ্ধ যোগানের পূর্ণ ব্যবহার করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, উৎপাদনপ্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু চাহিদার ঘাটতি-ঘটিত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় না, তাই তারা সর্বাধিক লাভের জন্য সীমাবদ্ধ শ্রম আর মূলধনের সাহায্যে সর্বাধিক যে পরিমাণ উৎপাদন করা যায় তাই করবে।

কেইন্‌স কিন্তু এ বিষয়ে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের সাথে একমত হতে পারেন নি। সঞ্চয় আর বিনিয়োগের উপর সুদের হারের প্রভাব সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁর ধারণায় পরিকল্পিত ভোগ, এবং সে কারণেই পরিকল্পিত সঞ্চয় প্রধানত আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং সুদের হারের ওঠানামায় সঞ্চয়ের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। তাঁর এই ধারণার যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি আছে বলেই দেখা গেছে। অপর দিকে তিনি মনে করতেন, বিনিয়োগব্যয় বিনিয়োগকারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধ্যানধারণার উপর নির্ভর করে, এবং সেই সম্বন্ধটি এতই ঘনিষ্ঠ যে সুদের হার বা অন্য-কোনো অর্থনৈতিক variable-এর সাথে বিনিয়োগের পরিবর্তনের কোনো সুস্পষ্ট যোগাযোগ দেখা যায় না। অতএব সুদের হার সঞ্চয় আর বিনিয়োগের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারে না। এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে, যে-কোনো উৎপাদন বা আয় থেকে যে পরিমাণ পরিকল্পিত সঞ্চয় হয়, তার সাথে পরিকল্পিত বিনিয়োগের কোনো সম্বন্ধ নেই; তারা সম্পূর্ণ আলাদা-আলাদা বিষয়ের এবং আলাদা-আলাদা গোষ্ঠীভুক্ত ইকনমিক এজেন্টের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই অবস্থায় উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের জন্যে সামগ্রিক চাহিদা আলাদা হতেই পারে।

উল্লিখিত বিষয়টি ছাড়াও কেইন্‌স ও ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের আর-এক জায়গায় বিশেষ পার্থক্য ছিল। কেইন্‌স মনে করতেন, মূল্যস্তর সামগ্রিক চাহিদা আর যোগানের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তার ওঠানামায় অনেক সময় লাগে। স্বল্পকালে মূল্যস্তরের সেরকম পরিবর্তন হয় না। সামগ্রিক চাহিদা যোগানের থেকে বেশি হলে, উৎপাদনপ্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ স্বল্পকালে সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণ সামগ্রিক চাহিদার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বিষয়টি কয়েকটি সমীকরণের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। ধরা যাক, পরিকল্পিত ভোগব্যয় হল c, সামগ্রিক উৎপাদনের অর্থমূল্য বা সামগ্রিক আয়, y, এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগব্যয় $\bar{I}$। সামগ্রিক আয়ই c-কে নির্ধারণ করে। ধরা যাক, c এবং y-এর মধ্যে সম্পর্কটি হল :

$$c = a + by \qquad (1)$$

সেখানে a ও b ধনাত্মক ধ্রুবক। পরিকল্পিত বিনিয়োগব্যয়কে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ বিনিয়োগকারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা এত অসংখ্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যে সেগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। অতএব পরিকল্পিত বিনিয়োগব্যয়কেও আমরা ধ্রুবক বলেই ধরে নেব। ধরা যাক,

$$\bar{I} = \bar{I} \qquad (2)$$

সামগ্রিক উৎপাদনের অর্থমূল্য চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতএব y নির্ধারিত হবে নিম্নলিখিত সমীকরণের দ্বারা :

$$y = c + \bar{I}$$
$$= a + by + \bar{I} \quad [(1) \text{ ও } (2) \text{ দ্রষ্টব্য}]$$

অথবা

$$y = \frac{a + \bar{I}}{1 - b} \qquad (3)$$

উপরের সমীকরণটির থেকে আমরা দেখতে পাই যে, y-এর পরিমাণ (এবং যেহেতু মূল্যস্তর স্বল্পকালে অপরিবর্তিত থাকে, তাই প্রকৃত সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমাণ) $\bar{I}$-এর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এটাও আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় যে, উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানগুলি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়লে এবং $\bar{I}$-এর পরিমাণ কমিয়ে দিলে, উৎপাদন হ্রাস পাবে, $\bar{I}$ যথেষ্ট না হলে শ্রম ও মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকবে, এবং বেকারসমস্যা প্রকট-ভাবে দেখা যাবে। উপরের সমীকরণটির থেকে এটাও আমরা বুঝতে পারি যে, সরকার সরাসরি বিনিয়োগে জড়িত হয়ে পরিকল্পিত বিনিয়োগ বাড়িয়ে দিয়ে অথবা ভোগব্যয় বৃদ্ধি করে মূলধন আর শ্রমের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব করতে পারে। সরকার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বা শাসনব্যবস্থার জন্য যে খরচ করে, তাকেই আমরা বলি সরকারি ভোগ, এবং সরকার রাস্তাঘাট, কলকারখানা বানানোর জন্য যে খরচ করে তাই সরকারি বিনিয়োগ।

উপরে আমরা যা আলোচনা করলাম তা ছাড়া কেইন্‌স্ ও ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের আরও বহু দিক আছে। টাকাকড়ি ও শ্রমের চাহিদা এবং যোগান সম্পর্কে তাঁদের মতবাদ এবং মতপার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এত অল্প জায়গায় ওইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা অসম্ভব।

এবার আমরা দেবপ্রসাদবাবুর বইটিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভুলের কথা উল্লেখ করব। বইটিতে তিনি বলেছেন (পৃ ৭), 'কেইন্‌স্ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের এমন সংজ্ঞা দিয়েছেন, যাতে ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের তারতম্য হতে পারে, কিন্তু সমগ্র সমাজে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সর্বদাই সমান থাকে। এই সমান হবার কারণ আর কিছুই নয়, কেইন্‌স্ প্রচলিত অর্থে ওই দুটি শব্দ ব্যবহার করেন নি, এবং সঞ্চয়ের এমন সংজ্ঞা দিয়েছেন যাতে সঞ্চয়ের অর্থই হল বিনিয়োগ। সুতরাং ও দুটো তো সমান হবেই।'

এই উক্তিটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। এটা ঠিকই যে প্রকৃত সঞ্চয় ও প্রকৃত বিনিয়োগ সব সময়ই সমান হয়, কিন্তু প্রকৃত সঞ্চয় আর প্রকৃত বিনিয়োগ নিয়ে কোনো তত্ত্বই মাথা ঘামায় না। তত্ত্বের দিক থেকে পরিকল্পিত সঞ্চয় আর পরিকল্পিত বিনিয়োগই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এগুলি কিভাবে সমতায় আসে তা নিয়েই কেইন্‌স্ ও ক্ল্যাসিকাল তাত্ত্বিকদের মতপার্থক্য। বিনিয়োগ আর সঞ্চয়ের সংজ্ঞায় কেইন্‌স্ আর ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের কোনো পার্থক্যই নেই।

আরেক জায়গায় লেখক বলেছেন (পৃ ১৯), 'ভবিষ্যতে সুদের হার বাড়বে সঞ্চয়কে বিনিয়োগ না করে, লোকে নগদ টাকা মজুত করবে এবং তার ফলে সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদার মধ্যে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি হবে। এইভাবে কেইন্‌স্ দেখালেন যে 'সে'-র নিয়ম অভ্রান্ত নয়, বরং বাস্তব জগতে তার ব্যতিক্রমটাই স্বাভাবিক।' এই উক্তিটিও বিভ্রান্তিকর। এটা ঠিক যে "হোর্ডিং"-এর ফলে সুদের হার তার "স্যাচারাল লেভেল"-এর উপরে থাকে, এবং যোগান চাহিদার থেকে বেশি হয়। আবার এটাও ঠিক যে কেইন্‌সের "নগদ পছন্দ তত্ত্ব"-কে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের মধ্যে নিয়ে এলে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই দুটি উক্তি আপাত-বিরোধী মনে হলেও সত্যি। অতএব, বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া এই বিষয়টির অবতারণা করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবেই।

আরেক জায়গায় (পৃ ১৫০) লেখক বলেছেন, 'কেইন্‌সের থেকে কালেস্কির বিশ্লেষণ ছিল বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।' এই উক্তিটি সন্দেহাতীত নয়। কারণ, তাঁদের দুজনের তত্ত্বই মূলত এক। তফাত যা আমরা দেখি তা আসে তাঁদের লেখার উদ্দেশ্যের পার্থক্য থেকে। কেইন্‌সের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের দুর্বলতাগুলিকে স্পষ্ট করে তুলে নতুন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা। তাই পুরাতন তত্ত্বের কাঠামোর সঙ্গে যথাসম্ভব সাদৃশ্য বজায় রেখেই তিনি নিজের তত্ত্বকে উত্থাপিত করেছেন। নিজের সিদ্ধান্তগুলি পাওয়ার জন্য এবং ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের দুর্বলতাগুলি প্রকট করার জন্য যে ন্যূনতম পরিবর্তন করা প্রয়োজন, সেইগুলিই তিনি করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য দ্রব্য ও সেবার বাজারে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই, শ্রমের বাজারে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতাই যথেষ্ট। সেই কারণেই তিনি দ্রব্য ও সেবার বাজারকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক রেখেছেন। কিন্তু দ্রব্য ও সেবার বাজারে প্রতি-

যোগিতা যে সাধারণত অপূর্ণাঙ্গ হয়, এবং তার ফলেই দ্রব্যাদির দাম সহজে পরিবর্তিত হয় না, এবং তার গুরুত্ব তাঁর থেকে বেশি করে কোনো অর্থনীতিবিদ যে উপলব্ধি করেছিলেন, তা আমার জানা নেই। বস্তুত আমরা যাকে "সিম্পল্ কেনসীয় মডেল" বলে জানি সেখানে দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে এবং সেই মডেলের সাথে কালেস্কির জাতীয় আয় নির্ধারণ মডেলের পার্থক্য কোথায় ?

ঠিক একই কারণে কেইন্‌স্ জাতীয় আয়ের বণ্টনের বিষয়টির উপর জোর দেন নি। যদিও জাতীয় আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আয়বণ্টনের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত ছিলেন।

অপরদিকে, কালেস্কির তত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাতীয় উৎপাদনের উপর আয়বণ্টনের প্রভাব এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের গতিকে অপ্রতিহত রাখার অসুবিধাগুলিকে স্পষ্ট করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেই কারণেই ওই বিষয়গুলিই তাঁর রচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। কেইন্‌স্ বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যার ভিত্তিস্থাপন করলেও, বাণিজ্যচক্রের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

আরেক জায়গায় লেখক বলেছেন, কেইন্‌স্ কালেস্কির কথা জানতেন না। এটি একেবারেই ভুল। এ প্রসঙ্গে আমি লেখককে ডন্ প্যাটিন্‌কিনের "অ্যানটিসিপেশন অব কেইন্‌স্" বইটি পড়তে অনুরোধ করব। সেখানে কেইন্‌স্ এবং কালেস্কির পরস্পরকে লেখা অনেকগুলি চিঠি ছাপা হয়েছে। এই চিঠিগুলির থেকেই কালেস্কি সম্পর্কে কেইন্‌সের মনোভাবের পরিষ্কার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলবার কথা এই যে, একটি সুপরিকল্পিত, সুসংহত কাঠামোর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা যথাসম্ভব বাদ রেখে যদি লেখক কেইন্‌সের তত্ত্বের আলোচনা করেন, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য বহুলাংশে সফল হবে। অনেক বিষয়ের তিনি অবতারণা করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে নিয়ে যতটা বিস্তৃত আলোচনা করা উচিত, তা তিনি করেন নি। তার ফলে স্থানে-স্থানে যুক্তির পারম্পর্য অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অনেক যত্ন করে তিনি বইটি লিখেছেন। উল্লিখিত ত্রুটিগুলি সারিয়ে নিলেই আলোচনা যে সকলের কাছেই উপভোগ্য হবে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

চিত্রকলা

নানা প্রেক্ষিতে চিত্রকলা : সম্ভাবনার সীমা ও সীমাবদ্ধতা

সমীর ঘোষ

'অবনীন্দ্রনাথের এক পরিকর একদিন কুণ্ঠা নিয়ে বলেছিল এই শিল্পীকে : অন্যেরা যখন আঁকেন তখন মনে হয় তাঁরা নূতন কিছু আঁকলেন বটে কাগজে, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের আঁকা দেখে তার ভাবতে ইচ্ছে করে যে ও-ছবি আগে থেকেই ছিল ক্যানভাসের মধ্যে, উনি কেবল অল্পস্বল্প দাগ বুলিয়ে জাগিয়ে তুললেন ছবিটাকে। পুরস্কৃত বোধ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, কেননা অন্তরগূঢ় এই রূপকে উন্মোচিত করে দেবার চেয়ে বড়ো আর কোন্ কাজ আছে শিল্পীর! কবিও তা-ই করেন, তবে আরেকটু জটিল তাঁর দায়। কেবল চোখে দেখা বিশ্ব নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রক্ষেপণকে একসঙ্গে টান দিয়ে ধরতে হয় তাঁর, সেই টান যদি জেগে ওঠে রচনার মধ্যে তাহলেই তাকে বলি সৃষ্টি, বলি প্রতিভা।' (রুচির সমগ্রতা : শঙ্খ ঘোষ : পৃ ৫১/ শব্দ আর সত্য)।

স্রষ্টির দায়ে কে বেশি এগিয়ে—চিত্রী না কবি ?

চিত্রীর চিত্রে কি তবে শুধুই মিশে থাকে চোখে দেখা বিশ্ব! পক্ষান্তরে কবি আরও একটু এগিয়ে জটিল দায়পূরণে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রক্ষেপণকে টান দিয়ে ধরতে আগ্রহী হন! স্রষ্টির দায়ে কে বেশি এগিয়ে,—চিত্রী না কবি, এ তর্কের কোনো সরল সিদ্ধান্ত না টেনে বরং লেখকের ভাবনার ভিতরে আর-এক ভাবনার স্বরূপ উন্মোচনের মধ্য দিয়ে চিত্রের শরীরী নির্মাণ এবং অন্তরগূঢ় ব্যঞ্জনার তাৎপর্যনির্ণয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রামের প্রক্ষেপণের সমগ্রতাকে অনুধাবন করা বরং বাঞ্ছনীয়। চিত্রী ও কবির নির্মাণভাবনার যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে শঙ্খ ঘোষের রচনায়, সেই ধারণার ভিত্তিতেই ছবিকে দেখার প্রচলিত অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত। আর এ কারণেই চিত্র অর্থে ই তা চোখে-দেখা-বিশ্ব-নির্ভর—এই বিশ্বাসে আমরা স্থির। অথচ ছবির দীর্ঘকালীন ইতিহাসের পটপরিবর্তনে দৃশ্য-গ্রাহ্যতার বাইরে, অনির্দেশ ইঙ্গিতে ছবি যে অনেকাংশেই বিচিত্রগতিমুখী, আমাদের চিত্র সম্পর্কিত ধ্যানধারণার অসম্পূর্ণতার কারণেই অভিজ্ঞতার যথাযথ বিকাশ ঘটে নি।

কবিতা এবং ছবি, আত্মপ্রকাশ কিংবা আত্মভাবনা বা দর্শনের ভিন্ন মাধ্যম মাত্র,—এ বিশ্বাস কমবেশি প্রচলিত থাকলেও, এভাবে বোধহয় যথাযথ চারিত্র-ব্যাখ্যা পূর্ণতা পায় না। বরং সত্যতার স্খলন ঘটে। কারণ, ভাবপ্রকাশের মাধ্যম কবিতা ও ছবি, দুই-ই, কিন্তু এ দুয়ের প্রকাশপ্রকরণের ধারা ভিন্নমাত্রিক। কবিতা মূলত শব্দনির্ভর। শব্দ কখনো আক্ষরিক অর্থে, কখনো ব্যঞ্জনায় ভাবপ্রকাশের সহায়ক। চিত্রের ক্ষেত্রে রেখা, রঙ এবং চিত্রপটের পরিসীমা—আর এরই সঙ্গে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর মধ্যবর্তী অবসর বা স্পেস সবই জড়িত। কবিতার শরীরবিশ্লেষণেও নানাবিধ টুকরো-টুকরো বিশিষ্ট বিষয় বা উপাদানসমূহ জড়িত। যেমন উপমা, প্রতীক-প্রতিমা বা ছন্দরীতির প্রয়োগকৌশল। কিন্তু দুই মাধ্যমের প্রকাশসম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাই এ-দুয়ের চরিত্রগত দূরত্ব সহজে চিহ্নিত করে।

কবিতায় শব্দের ভূমিকা প্রধান। কবিতার শরীরী

বিন্যাসে শব্দের অমোঘ প্রয়োগেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। দীর্ঘ অনুশীলনে অভিজ্ঞতায় শব্দের চূড়ান্ত ব্যবহারে কবি নিরন্তর মগ্ন থাকেন। অতৃপ্তি থেকে তৃপ্তিতে পৌঁছতে কবি গলদ্‌ঘর্ম হন। বারবার সংশোধনের নিরবচ্ছিন্ন শ্রমে কিংবা কখনো-কখনো কোনো কবি সময়ান্তরেও কবিতায় শব্দের সংস্কার সাধন করে থাকেন। এ সবই ভাব বা ভাবনার যথাযথ রূপায়য়সাধন।

চিত্ররচনার ক্ষেত্রেও চিত্রী অনেকাংশেই ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে একই পথ অবলম্বন করেন। রেখা বা রঙের কোনো চারিত্রিক নির্দিষ্টতা বা স্থিরতা নেই বলেই, দুর্ঘটনা না বললেও অনিশ্চয়তাকেই নিয়ন্ত্রণে এনে প্রতি মুহূর্তের ভাবনা ও প্রকাশের দ্বন্দ্বসমাধানে শিল্পীকে চতুর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হয়। নির্দিষ্ট সীমার ঘেরাটোপে পটে প্রচ্ছন্ন ভাবনাকে শরীরী রূপ দিতে চিত্রী স্বয়ংবশ কোনো উপাদানের নাগাল পান না। রেখা ও রঙ সব সময়ে শিল্পীর নিয়ন্ত্রণাধীন, এমন বলা চলে না। চাহিদা অনুযায়ী প্রকাশের শর্তও পালন করে না। এ ছাড়া রেখার সঙ্গে রেখার বা রঙের সঙ্গে রঙের আকর্ষণ-বিকর্ষণ, পটের বিস্তারী আবহ—এসবই দৃশ্যগ্রাহ্য বা কল্পভাবনা উভয় বিষয় রূপারোপেই নানা সংকট এবং অনভিপ্রেত সমাধানের জটিল ক্রিয়ায় শিল্পীকে সচল রাখে। সুতরাং কবিতার বিষয় বা ভাব প্রকাশের দায় এবং চিত্রের প্রকাশ দায়ের সীমা ও সীমাবদ্ধতা সমার্থক নয়।

> ছবি কি স্পেসনির্ভর সীমাকে বাঙ্ময় অনিঃশেষ
> সীমায় ছড়িয়ে দেয় নি ?

কবি ও চিত্রকরের নির্মাণভাবনার সূক্ষ্ম বিভাজন-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। ভাব হইতে ভাবান্তরে তাহার গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগরসংগম পর্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কবি কেবলমাত্র স্থির আকৃতি চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ীভাব মাত্র তিনি বর্ণনা করেন না, গম্যমান শরীর প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সূত্র ধরেই শঙ্খ ঘোষ লেসিং-এর "লাওকুন" গ্রন্থসূত্রে ছবি আর কবিতার প্রভেদরেখা স্পষ্ট করেন—'ছবি স্পেস বা দেশ-সন্নিহিত আর কবিতা হলো কাল-বিন্যস্ত।' আর সতর্ক প্রশ্ন তোলেন, 'কথাটা কি তবে এই যে কবিতায় আমরা চাই সঞ্চরমাণ ছবি, স্থির ছবির বদলে?' এবং পরক্ষণেই উক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজেন,—'কিন্তু আধুনিক ভাবনায় এ-সঞ্চারকে কবি খোঁজেন আরো অন্য অর্থে। কবিতার আধুনিক প্রতিমায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানিক রূপের সঙ্গে গূঢ়ভাবে মিশে যায় সময়ের বোধ, দেশ-কালে সমপৃক্ত হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় এক-একটি ছবি।'

চিত্রকরের চিত্র কি তবে শুধুই পটে লেখা স্থির দৃশ্যকল্প মাত্র! রবীন্দ্রভাবনা পেরিয়ে একালের কবি আরো এগিয়ে যেতে চান। অবশ্য চিত্রীর চিত্রকে রবীন্দ্রভাবনার অনুসরণে তিনি স্থির প্রমাণেই আগ্রহী। পক্ষান্তরে কবিতা শুধুমাত্র সঞ্চরমাণ ছবি নয়, এ ধারণা এক সময় থেকে অন্য সময়ে, অনুভবের গূঢ়ার্থে মিশিয়ে নিতে আগ্রহী হন কবি শঙ্খ ঘোষ। হয়তো এটাই সত্য এবং সঙ্গত। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মনে, কবিতা যদি সময় থেকে সময়ান্তরে রূপান্তরিত অনুভবের অভিজ্ঞতায় সঞ্চরমাণ ছবি থেকে আরো যোজন-যোজন দূরবিস্তারী ইন্দ্রিয়লোকে প্রবেশ করতে পারে, তবে ছবিও কি সময়ান্তরে তার প্রয়োগসম্ভাবনার ব্যাপ্তিকে, স্পেসনির্ভর সীমাকে, দৃশ্যমান স্থিরভূমি থেকে ব্যঞ্জনার অনিঃশেষ সীমায় ছড়িয়ে দেয় নি?

পিকাসো একবার আলোচনাপ্রসঙ্গে জানিয়ে-ছিলেন—'আমার ল্যান্ডস্কেপ আর আমার নগ্নচিত্র সমার্থক। আমার আঁকা মুখগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে

লোকজন বলে ওঠে, "নাকটা বাঁকাচোরা করা হয়েছে," কিন্তু তারা কখনই একটা বাঁকাচোরা ব্রিজ দেখে অবাক হয় না। কিন্তু আমি উদ্দেশ্য নিয়েই নাকটা বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দিই, কারণ আমি লোকজনকে জোর করে শেষ পর্যন্ত, নাকটিকে, দেখাতে চাই।'

পিকাসোর উক্তিতে আমাদের অভ্যস্ত ভাবনায় আঘাত লাগলেও শিল্পের আধুনিক তত্ত্ববিশ্বে এর সত্যতা অমোঘ। ল্যানডস্কেপ বা নগ্নচিত্র সমার্থক তখনই যখন শিল্পীর কাছে দৃশ্যবস্তু শুধুমাত্র তার স্বকীয় গঠনের অন্তরে বৃত্তবন্দী না থেকে শিল্পভাষায় রূপায়িত হয়ে ওঠে। তবু বাস্তবতা বা সাদৃশ্য-চিহ্ন কি একান্তই পরিত্যাজ্য হয়ে উঠতে পারে? পিকাসো নিজেই তাঁর কাজে, ভাবনায় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন—'শিল্প তো একটা ধোঁকা মাত্র, যা দিয়ে সত্যের কাছে পৌঁছানো যায়। অনেক শিল্পী বিশ্বাস করেন যে তাঁদের কাজ মানে তাঁদের ক্যানভাসটাই "সত্য"। "সত্য" তো থাকে ক্যানভাস পেরিয়ে, ক্যানভাসের ভিতরে নয়। ক্যানভাসের সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে তাকে পাওয়া যায়।' পিকাসো বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চান নি। বাস্তবকেই তিনি পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন। আর স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন, 'নীরবতাতেই বাস্তবে পৌঁছানো যায়।'

একজন শিল্পী সবকিছু থেকেই শিল্পসৃজনের রসদ সংগ্রহ করেন। আকাশ মাটি একটুকরো কাগজ থেকে শুরু করে চলমান কোনো আকার, এমনকী মাকড়শার জাল,—এসবই শিল্পীকে প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু এগুলির চরিত্রগত ভিন্নতার পরিবর্তে, পিকাসোর কাছে সবই সমার্থক হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁর বিশ্বাস, আকারের কোনো শ্রেণীবিন্যাস নেই। আর এই বিশ্বাসেই তো রয়েছে পরিবর্তমান অভিজ্ঞতার উৎক্ষেপ, যার নাম আধুনিকতা।

চিত্রকলায় নিরবয়ব বিমূর্ত তত্ত্বকে পিকাসো খুব বেশি প্রশ্রয় দেন নি। আকার চিত্র ও নিরাকার চিত্র —এই ভিন্নতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কোনো কিছুই আকার ছাড়া গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। একটি মানুষ, একটি বস্তু বা একটি বৃত্ত—সবই আকার। অবশ্য কিছু-কিছু আকার বা গঠন আমাদের অনুভবে বিশেষ প্রিয়, কিংবা পরিচিত, যা আমাদের আবেগকে সংক্রামিত করতে পারে সহজেই। আবার কিছু আকার বুদ্ধির পথ বেয়ে আবেগে পৌঁছয়। পিকাসো শিল্পকে এভাবেই ভাবতে চেয়েছেন।

অভিজ্ঞতার পরিণতিতে এসে অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় সাময়িক উৎসাহ হারিয়েছিলেন। ছবি আঁকা ছেড়ে দেবার কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন,—'...এখন যা মনে করি তাই আঁকতে পারি। ডিফি-কাল্‌টি ওভারকাম করবার যে একটা আনন্দ তা আর পাইনে।' ঠিক একই ভাবে পিকাসোও ভেবেছিলেন —'যাতে পৌঁছোবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নেই, মেটাবার মতো সমস্যা নেই, ভেদ করার মতো রহস্য নেই, বিদ্ধ করার মতো কোনো অন্তরাল নেই — তাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই।' শিল্পসৃজনের মূল রহস্য বোধহয় এখানেই। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, সমস্যা-রহস্য এবং অন্তরাল - এই বিবিধ বাধার পাহাড় ঠেলে তবেই পৌঁছতে চাই সেই কৌতূহলের নিবৃত্তির সীমায়। পাই বা না পাই কিংবা বলা চলে যা চাই তা পূর্ণত পাই না বলেই অতৃপ্তির টানে, রহস্য উন্মোচনের আগ্রহ অধীর হয়ে ওঠে। আর এই চাহিদাই অবিরত তাপ যোগায় সৃজনে।

বস্তুর বাহ্যিক রূপের আড়ালে শিল্পিত রূপের সত্য

সাহিত্যে আধুনিকতার অর্থাৎ 'হালের কায়দা'র বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নব্য চিত্ররীতি-ভাবনাকেও সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। 'সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করে-ছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধ প্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনো-

হারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য।' ছবিতে ভাব, প্রকৃতির নকলনবিশি বা অন্য প্রকারে নয়,—'আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা'ই যে আধুনিক ছবির ভাব ভাষা প্রকাশ পাচ্ছে তাতেই রবীন্দ্রনাথের অসন্তোষ।

এখন প্রশ্নটা এভাবে আসতে পারে—সাহিত্য বা চিত্রে তথ্যের যান্ত্রিক প্রকাশ বর্জনীয়। বরং সত্যের অসীমতার প্রকাশ ঘটানোই যথার্থ সৃজনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সত্যের সংজ্ঞার্থ যেহেতু নির্দিষ্ট নয়, ফলত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সময় থেকে সময়ান্তরে যুগধর্মের বিশিষ্টতা, এমনকী ব্যক্তির রুচি বা অভিজ্ঞতার পরিবর্তনীয় প্রভাবেও সত্যের সীমা বা অর্থের রূপান্তর ঘটাতে পারে, সৃজনের গঠনপ্রক্রিয়াকেও তা প্রভাবিত করে। ভাবনার বৈপরীত্য, দ্বন্দ্বের চঞ্চলতায় রবীন্দ্রনাথ নিজেও কি বারবার বিদ্ধ হন নি!

প্রথামুক্ত রূপের অন্বেষা

কবিতায় উপমাব্যবহারে শুচিতা বা সুন্দরের প্রকাশ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশেই প্রচলিত রীতি বা অভিজ্ঞতার অনুসারী ছিলেন। অন্তত ব্যঞ্জনার প্রয়োগে কবিতার ভাবপ্রকাশে, প্রসাধনবিন্যাসে, ঐতিহ্যের দাবি অস্বীকার করেন নি। মনোজয়িতা নয়, মনোহারিতার প্রতি তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। এরই বিপরীতে ছবিতে তিনি প্রচলিত ধারণায় যা সুন্দর, তাকে অস্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। 'আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে, "বেশ সুন্দর হয়েছে," তখনই আমি তা নষ্ট করে দিই। খানিকটা কালি ঢেলে দিই, বা এলোমেলো আঁচড় কাটি। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমনি করে তার এক-একটা রূপ বের হয়।' বস্তুর বাহ্যিক রূপের বাইরে শিল্পিত রূপের পরম সত্যকেই রূপকার রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে চাইতেন। অনির্দিষ্ট রেখার আঁচড় আর প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় কালি ঢেলে নষ্ট করার প্রবণতা আসলে প্রথামুক্ত রূপেরই অন্বেষণ। আর এই পরিবর্তিত রূপচেতনা একান্তই কবি-চিত্রীর ব্যক্তিবোধের সীমায় আবদ্ধ। অথচ কবিতায় তিনি বারবার ভাঙা-গড়ার খেলায় মাতলেও এলোমেলো আঁচড় কাটার, অনির্দিষ্ট রূপসাধনার, অনিশ্চয়তায় অন্বেষাকে খুব বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন, তেমন প্রমাণ মেলে না। অন্তত ছবিতে তিনি যেমন দ্বিধাহীন সোচ্চার, তার পাশে সাহিত্যে বা অন্য সৃজনে অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে, পা মেপে চলতে চেয়েছেন। ডাডাইজম বা কিউবিজম তত্ত্ব-আন্দোলনের বিষয়ভাবনায় তিনি সংশয়চিত্ত হলেও, চিত্ররীতিতে এর প্রভাব আপাত-বিধ্বংসী জেনেও ভবিষ্যতে সুফলপ্রাপ্তির আশা পোষণ করেছেন। সাহিত্যে এই নব্য আন্দোলনের প্রভাবকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন নি।

এমনই এক দ্বন্দ্বে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথও আবর্তিত হয়েছিলেন। কিউবিজমতত্ত্বকে তিনি ব্যঙ্গের ছলে "কুজ্জাইজম" বলে পরিহাস করেছেন। অথবা তাঁর সাহিত্যকর্মে, ভাব ও ভাষা প্রয়োগে শুধুমাত্র চিত্র বা চিত্রকল্পই নয়, আধুনিক পরাবাস্তব নীতিকে ব্যবহার করছেন সুচিন্তিত মগ্নতায়।

'ডিফিকালটি ওভারকাম করার যে একটা আনন্দ তা আর পাইনে।' সাময়িক ছবি না আঁকার কারণ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন। এই সময়ে তিনি তুচ্ছ বস্তুর মধ্যেও কত সব সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। 'এ চোখ আমার আগে কোথায় ছিল'—এই বিস্ময় মূলত সময়ান্তরে সৃজনের নব্য দিশাপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া। বর্জনীয় বস্তুসম্ভারের মধ্যে থেকেই তিনি রূপকে উদ্ধার করেছেন। বিচিত্র বিপরীত সামগ্রীর সংযোজনে গড়ে তুলেছেন রূপকল্প। এ শুধু খেলা, এমন বিশ্বাসে মন সায় দেয় না। কারণ কাঠকুটোয় গড়া কুটুম-কাটাম-এর পাশাপাশি শেষ কুড়ি বছরের ছবি ও লেখায় অবনীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী রীতিকে ভাঙতে সচেষ্ট ছিলেন। অনুসন্ধান করেছেন

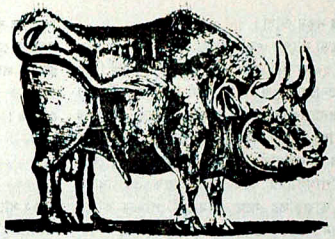

3rd state, December 18th, 1945 4

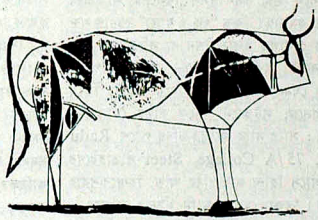

7th state, December 28th, 1945 6

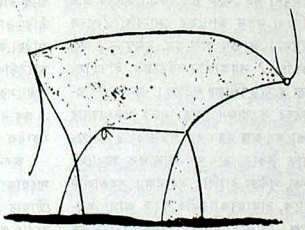

11th state, January 17th, 1946

শিল্পী পাবলো পিকাসো-কৃত অঙ্কনের অংশবিশেষ : রূপভাবনার সাদৃশ্যকরণ থেকে বিমূর্ত ব্যঞ্জনার ক্রমপ্রসার এখানে লক্ষণীয়।

সৃজনের নতুন ভাষা।

'বড়ো মাপের একটি খাতা, লাইনটানা ছোটো-ছোটো হরফে ভরা দুশো একচল্লিশটি পৃষ্ঠা, এই নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের "খুদ্দুর যাত্রা" বা "খুদি রামলীলা"। অবনীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় রচনার সম্ভারে এ ধরনের পুঁথিপালা বা যাত্রা ঢঙের রচনা কম নয়। তবু "খুদ্দুর যাত্রা"র রচনাপ্রণালী বিশিষ্টতায় অনন্য। শঙ্খ ঘোষ তাঁর "পাগলামির কারুশিল্প" প্রবন্ধে এই বিচিত্র রচনার কারুকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। চোখে দেখার সুযোগ না হলেও, বিষয়-বর্ণনায় এর গুরুত্ব উপলব্ধিতে অসুবিধা ঘটে না। লেখার সঙ্গে ছবি, এমন যুগল মিলনের অভিজ্ঞতা আমাদের কম নয়। কিন্তু "খুদ্দুর যাত্রা" রচনার শব্দ আর ছবি প্রথাগত ইলাসট্রেশন বা সচিত্রকরণ মাত্র নয়। বিষয়ের অর্থব্যঞ্জনার নতুন মাত্রা স্থাপনের সহায়ক। যেমন 'রামের খড়ম নিয়ে ভরতের ফিরে আসা প্রসঙ্গে, লটকানো থাকে রাতুর দোকানের বিজ্ঞাপন : সারি সারি জুতোর ছবির পাশে Radu & Co, 75/A College Steet'-সীতাহরণের প্রসঙ্গে আসে হিন্দি ছায়াছবির অংশ, হিন্দকেশরীর বিজ্ঞাপন। 'এক্ষণে দেখাও আনি সীতার আভরণ—বাছা হনুমান' বলছেন রাম, আর তার পাশে গয়নার দোকানের নমুনা বই থেকে দুল কিংবা হারের ছবি সাজানো, কিংবা নতুন কাপড়ের সোনালি লেবেল কেটে লাগানো। আশ্চর্য হতে হয়, যুদ্ধসূচনার জন্য পাব স্বস্তিকা চিহ্ন।' সমকালীন ঘটনাক্রম, ইতিহাস-চেতনাও যুক্ত হয়েছে শিল্পের শরীরে। রচনার শরীর-নির্মাণে এসবের সংযোজন কিন্তু নিছক গল্পভাবনার চিত্ররূপ প্রকাশের জন্য নয়। বরং গল্পভাবনার সমান্তরালে আপাত টুকরো ছবি বা প্রাসঙ্গিক সংবাদের অর্থময় যুক্ততা, পূর্ণতর ব্যাপ্তির সহায়ক। সমকালীন সমাজপ্রেক্ষাকে, রামায়ণকাহিনীর সূত্রে আসা কল্প-ভাষ্যের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি সৃজনসম্ভাবনাকেই প্রসারিত করতে চেয়েছেন। আধুনিক সাহিত্যে বিশেষত কবিতানির্মাণে শব্দের সঙ্গে ব্যঞ্জনাপ্রকাশের সহায়ক রেখাচিহ্ন বা অক্ষরের চিত্রবিন্যাস যুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। আকার বা গঠনের নির্বাক অভি-ব্যক্তিকে সাহিত্য সচেতন প্রয়াসেই আয়ত্ত করতে চেয়েছে।

কোলাজের আবির্ভাব

১৯১২ সালের প্রথম অর্ধে 'Still life with Chair-Caning' নামের একটি ছবি আঁকেন পিকাসো। এই ছবিতে বেতের তৈরি আসনটি রঙতুলিতে আঁকার পরিবর্তে হুবহু বেতের নকশা-ছাপা একটুকরো অয়েল-ক্লথকে শিল্পী চিত্রপটে আঠার সাহায্যে সেঁটে দেন।

শিল্প-ঐতিহাসিকগণের মতে এটিই প্রথম কোলাজ চিত্র। সমসময়ে পিকাসোর সহকর্মী শিল্পী ব্রাক্ তাঁর একটি ছবিতে এভাবেই রঙতুলির সাহায্য ছাড়াই ওয়ালপেপার ব্যবহার করেন। সাদৃশ্যধর্মী কোনো বস্তুকে রঙতুলির সাহায্যে না এঁকে, পরিবর্তে সমধর্মী ছাপা ছবি বা অন্য কোনো বস্তুর সংযোজনে কাঙ্ক্ষিত ফললাভের চেষ্টাই ছিল এই প্রয়োগসাধনের অন্যতম উদ্দেশ্য। তা ছাড়া রঙরেখার পাশাপাশি সমধর্মী বা বিধর্মী বস্তুর ব্যবহার চিত্রপটের অনুভূতি-গ্রাহ্য ব্যঞ্জনার মাত্রাপ্রসারে অধিক সহায়ক—এমনই তাঁরা ভাবছিলেন। কিউবিজম এবং পরবর্তী ডাডা বা সুরিয়ালিজম তত্ত্বভাবনার মধ্যবর্তী পর্যায়ে কোলাজের আবির্ভাব, চিত্রপট সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের আমূল রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করেছিল। এ শুধু নয়নশোভন ভঙ্গিমার নয়, গতিব্যঞ্জনার যথার্থ সহায়ক।

অবনীন্দ্রনাথের "খুদ্দুর যাত্রা" পালায় ছাপা ছবির সংযোজনেও কি ছিল কোলাজের দূরপ্রসারী মাত্রাকে ছোঁয়ার কোনো চেষ্টা? কিংবা এপার-ওপার দূরত্বের মধ্যেও অবচেতন স্তরেই প্রকাশ পাচ্ছিল স্বপ্নসম্ভাবনার গতিচিহ্ন!

'ছবিটবি কিছু নয়। ছেলেমানুষি। গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানারকম শব্দ বাজিয়ে-বাজিয়ে দেখছি কীরকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্রণ, বৈষ্ণবপদের চিত্ররূপ, কাব্যসাহিত্যের আবেগধর্মিতা এবং আলেখ্যগুণে ছবি সম্পন্ন করতে অবনীন্দ্রনাথ যথেষ্টই উৎসাহী ছিলেন। জাতীয়তা এবং স্বদেশীয়ানার জোয়ারে ভারতশিল্পের "আইডেনটিটি" অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপ খোঁজার তাগিদে যদিও তিনি ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন, তবু তাঁর শিষ্যদের মতো আন্তরিক সহজতায় যুক্ত হতে পারেন নি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে মনে, তিনি শব্দ বাজিয়ে ছবি ধরার খেলায় যুক্ত হতে চান কেন? তবে কি রঙরেখার পরিবর্তে শব্দের সাহায্যে চিত্র-প্রতিমা প্রকাশের সম্ভাবনাকে তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন মনে-মনে! তা বোধহয় নয়। কারণ প্রচলিত শব্দবিন্যাসে অভ্যস্ত বা মনোগ্রাহী ছবি তৈরি করতে তাঁর আগ্রহ এই পর্বের রচনায় তেমন নেই। বরং অর্থের সঙ্গে অনর্থের মিল ঘটিয়ে, শব্দের শরীর থেকে অর্থের পোশাক খুলে, ধ্বনি-ছন্দের ছবি ধরতে তিনি অধিক আগ্রহী। আর সেজন্যই এই গড়ে-ওঠা ছবি কোনো বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা না ছুঁয়ে, প্রকাশ ঘটায় এক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী ভূমিনির্ভর কল্পচিত্র যা আধুনিকতায় পরা-বাস্তব বা সুরিয়ালিজমের ধারাসঙ্গী। এভাবেই হয়তো শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ চিত্রের অভ্যস্ত রীতির বদল ঘটাতে চান, বাজিয়ে নিতে চান শব্দের নির্ভরতায়। কিন্তু মনে-মনে বুঝতে চান, ধরতে চান যে ছবি, তাকে রেখারঙে প্রকাশেই থাকে.পূর্ণতর উত্তরণ। সময় থেকে সময়ান্তরে অবনীন্দ্রনাথ পৌঁছে যান অভিজ্ঞতার এক বোধ থেকে অন্য আর-এক বোধে।

চিত্রকলায় বিষয়ভাবনা : প্রকাশরীতির চারটি প্রধান ধারা

চিত্রকলায় বিষয়ের প্রকাশভাবনার নানা রূপান্তর সময়ের চলমানতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পরিবর্তিত হয়েছে আদিম গুহাচিত্র কিংবা শহুরে কৃষ্টির প্রভাব-মুক্ত লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিবিধ কারণে ভিন্ন। প্রাতিষ্ঠানিক ধারার বিবর্তনের স্তরে, চিত্র-কলার বিষয়ভাবনার প্রকাশরীতিকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। বাস্তববাদী বা রিয়ালিস্টিক, আদর্শবাদী বা আইডিয়ালিস্টিক, প্রতীকীবাদী বা সিম্বলিক এবং বিমূর্তবাদী বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারা। যে-কোনো একটি প্রচলিত বা প্রাত্যহিকের পরিচিত নামবস্তুর সাহায্যে আমরা উপরি-উক্ত শিল্পপ্রকরণের চার ধারার প্রয়োগের ফল প্রমাণ করতে পারি। বিভিন্ন রীতি বা ধারার প্রয়োগে একই বস্তু নানা রূপে পরিবর্তিত হতে থাকে। মা ও ছেলে—এই চিরন্তন বিষয়ভাবনাই হোক কিংবা একটা ফুল বা নিসর্গের দৃশ্য, যাই হোক না কেন—বাস্তববাদী ধারায় তা বস্তু-রূপের যথাযথ প্রকাশনির্ভর। আদর্শবাদী ধারায় শিল্পী চান, সাদৃশ্যধর্মিতার যথাযথ তথ্য প্রকাশের পরিবর্তে ভাব বা মনন প্রয়োগে আরোপিত ব্যঞ্জনা। এক্ষেত্রে রূপারোপের কারণে সাদৃশ্যধর্মিতায় কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটে। প্রতীকীবাদী প্রকরণে শিল্পী তাঁর মানসভাবনার প্রকাশ ঘটান। বস্তুর বাহ্যিক গঠন নয়, অন্তর্গত সত্তার প্রকাশেই তার সার্থকতা। বস্তু হয়ে ওঠে বাহুল্যবর্জিত রূপের প্রতীকী-প্রতিমা। আর বিমূর্তবাদী ধারায় এই একই বিষয় হয়ে ওঠে ব্যক্তিবোধের বা ইন্দ্রিয়-অনুভবের অনুচ্চার প্রকাশ। বস্তুর সাদৃশ্যরূপের বিকল্পে গড়ে ওঠা রেখারঙের দ্বিতীয় ভুবন।

যামিনী রায়ের ছবির নারী, সদৃশাত্মক নয়, অথচ পরিচিত রূপের পথ বেয়েই ঘটে রূপান্তর। বাস্তবতা থেকে আদর্শবাদী ছবির এই পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে প্রতীকে উন্নীত হয়। সাদৃশ্যচিহ্নের ক্রমবর্জনে, সরল-রূপের বিন্যাসে গড়ে-ওঠা প্রতীকী চিহ্নের উদাহরণ ব্রতচিত্র বা লোকায়ত পুতুল-প্রতিমায় বহুল ব্যবহৃত। এমনকী আদিম গুহাচিত্রও আজকের আধুনিক ভাষ্য অনুযায়ী প্রতীকী কিংবা বিমূর্তির স্পর্শে চিহ্নিত।

সমসময়ের সৃজনপ্রেরণার অবাধ উৎস।

চিত্রে ইম্প্রেসনিজম তত্ত্বভাবনা

১৮৭০ থেকেই ফ্রান্সে ইম্প্রেসনিজম তত্ত্বভাবনার শুরু। এই আন্দোলনের প্রকাশ মূলত স্টুডিও পেনটিং-এর বিরুদ্ধে মুক্ত প্রাকৃতিক আবহে মিশে যাবার অভিপ্রায়ে। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী শিল্পীরা চেয়েছিলেন প্রকৃতিকে জানতে। শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় নয়, পূর্ণতর সত্যের সন্ধানে তাঁরা আলো, ছায়া, প্রতিচ্ছায়া এবং সময়ান্তরে প্রকৃতির পরিবর্তনের রঙকে ধরতে চেয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক রীতিপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সত্যের অনুভবে যাত্রাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। এই চিন্তার বিবর্তনে নানা ধারার উদ্ভাবন ঘটে। শিল্পীব্যক্তিত্বের নিজস্ব ভাবধারায় গড়ে ওঠে পয়েনটিলিসম, ডিভিশনিজম, নিও-ইম্প্রেসনিজম প্রভৃতি নানা রীতি-তত্ত্ব।

চিত্রভাবনার এইসব তত্ত্বরীতি যে স্বয়ম্ভু, তা নয়। পূর্ববর্তী ধারার প্রভাবে কিংবা সমসময়ের ভাবনার পারস্পরিক মিশ্রণে গড়ে উঠেছে নব্যরীতি। প্রাচীন শিল্প বা লোকশিল্পের আঙ্গিক, অলংকরণের সম্ভাবনাকে আজকের শিল্পীরা ব্যবহার করছেন, আধুনিকতার নতুন মাত্রায়, রূপারোপের তাগিদে। যেমন ইঞ্জিপ্সিয়ান দেওয়ালচিত্র বা জাভানি মন্দিরফলকচিত্র থেকে পল গগাঁ কিংবা জাপানি কাঠখোদাইচিত্র থেকে ভান গখ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এভাবেই সময়ান্তরে পিকাসো, মাতিসসহ বহু চিত্রকর, বিচিত্র সমাজসম্ভারকে সৃজনে ব্যবহার করেছেন। এদেশেও অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় থেকে সমসময়ের শিল্পীরাও প্রাচীন কিংবা লোকজ আঙ্গিক আত্মস্থ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

'ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনার বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে উদ্দীপনার বিশুদ্ধতা অনুভব করা এযুগে শিল্পের অন্যতম লক্ষণ।' শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ধারণায় আধুনিক শিল্পের স্বরূপ এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন শিল্প-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে চিত্রের মূল উপাদান রঙ ও রেখার বিচিত্র ব্যবহার, সম্ভাবনার বহুতর দিশা উন্মুক্ত করতে সাহায্য করেছে। মিশ্রণের পরিবর্তে মৌলিক বর্ণের প্রত্যক্ষ প্রয়োগে ছিল এমনই এক নব্যনির্মাণের চিহ্নসূত্র। বিন্দুর সাহায্যে কিংবা কর্কশ ভাঙা রেখার আপাত অবিন্যস্ত টানে ছবি হয়ে উঠেছে ইন্দ্রিয়-অনুভবের নিকটবর্তী। 'ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে পল সেজান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, চিত্রনির্মাণের জন্য রেখাত্মক গুণ অপরিহার্য। দৃশ্য ও স্পর্শের অভিনব সংযোগ সেজানের চিত্রে পাওয়া গেল।' এভাবেই বিভিন্ন শিল্পী, ব্যক্তিবোধ এবং রুচিভাবনার প্রেক্ষিতে বিষয়ের ব্যঞ্জনা, দৃশ্যময়তার সৌন্দর্যকে, মননের স্তরে উন্নীত করেছেন। পরবর্তী বিমূর্ত রীতির চর্চা এবং তত্ত্ব অর্জিত অভিজ্ঞতার সূত্রেই বিকশিত হয়েছে। শিল্পী ক্যানডেনস্কি, মন্দ্রিয়েন, পল ক্লী এবং আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীর ব্যক্তিক দক্ষতায় চিত্রের ভাষা, প্রচলিত রীতি-অভিজ্ঞতার বাইরে নব্যদর্শনে আজ প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত।

'Art does not reproduce the visible —it makes visible.' শিল্পী পল ক্লী-র এই উক্তিতেই ধরা আছে আধুনিক শিল্পতত্ত্বের উৎসভাবনা। চিত্রপটের শূন্যতায় রেখা ও রঙের ব্যবহার যে কত ব্যাপক মাত্রা সৃষ্টির সহায়ক, তারই সন্ধান চলেছে এ কালে শিল্পভাবনায়। কখনো বিষয়- বা বস্তুনির্ভর রূপকল্পনার স্বপ্নময় ব্যঞ্জনা, কখনো আখ্যানের ঈষৎ আভাস, আবার কোথাও আখ্যান- বা বিষয়-নিরপেক্ষ কিন্তু বস্তুর অন্তর্গত সত্তার তাৎপর্য বা রহস্য উন্মোচনের অন্বেষা,—এভাবেই শিল্পী বারবার চেয়েছেন রঙরেখার মূক ভাষাকে বাঙ্ময় করতে। পিয়ের মন্দ্রিয়েনের নিসর্গচিত্র ক্রমে-ক্রমে কীভাবে আপাত অর্থহীন শূন্যতায় রেখা আর রঙের ক্ষেত্রতলে রূপান্তরিত হয়, অর্থপূর্ণ নব্যতায় পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে তার সন্ধান পাই শিল্পীর আত্মকথনে,

Non-representational art shows that 'Art is neither the expression of external appearance—as we perceive it—nor the expression of our life—as we experience it; it is rather the expression of true reality and of true life...indefinable, yet realisable in the fine arts.'

'অন্তঃস্থিত প্রেরণার অবচেতন প্রকাশ'—ক্যানডেনস্কি এভাবেই ভাবতে চাইছিলেন, ১৯১১ সালে আঁকা Improvisation শিরোনামের চিত্রমালাকে। বিমূর্ত চিত্ররীতির পরীক্ষানিরীক্ষার এটাই সূত্রপর্ব। ১৯১২ সালে 'On the Spiritual in Art' রচনার তত্ত্বভাবনায় বিমূর্ত শিল্পকে দর্শনীয় সংগীতের স্তরে উন্নীত করতে, তাঁর প্রয়াস সবিশেষ লক্ষণীয়। আধুনিক ইউরোপীয় চিত্ররীতির মূল সাধনা বিশুদ্ধ বা সার্বভৌমের সন্ধান, যার অন্বেষায় শিল্পী রঙরেখার সীমাহীন সম্ভাবনাকে প্রয়োগ করতে আন্তরিকভাবেই সচেষ্ট ছিলেন।

চিত্রে আধুনিকতা এবং লোকায়ত ধারার সংশ্লেষণ

পাশ্চাত্যের শিল্প-ইতিহাসের ক্রমানুসারী পর্যায় যদিও আমাদের ভারতীয় শিল্পধারায় লক্ষণীয় নয়, তবু বিচ্ছিন্নতার মধ্যে স্মরণীয় শিল্পী-ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় সৃজনভাবনার নব্য দিশা নির্মাণের ফলপ্রসূ আবহ তৈরি হয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পে আধুনিকতাকে প্রথম যিনি সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হন, তিনি শিল্পী যামিনী রায়। লোকশিল্পের অন্তর্গত বোধকে আত্মস্থ করে, ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে লোকায়ত ধারার সংশ্লেষণে তিনিই অগ্রদূত। শুধুমাত্র নয়নশোভন আঙ্গিকে আকৃষ্ট হয়েই নয়, যুক্তিতত্ত্বের বিচারে শিল্পনির্মাণের ভাষা অনুসন্ধানে তিনি আগ্রহী ছিলেন। তথ্যের বিচারে শিল্পী নন্দলাল যদিও তাঁর চিত্রকর্মে লোকশিল্পের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন যামিনী রায়ের বহু পূর্বেই, তথাপি নন্দলালের চিত্রকর্মে আধুনিক শিল্পতত্ত্ব, লোকায়ত শৈলীর সংশ্লেষে সচেতন নির্মাণের ভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষণচিহ্ন হয়ে ওঠে নি।

"পটুয়াশিল্প" রচনায় যামিনী রায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন—'যে আদিম শিল্পীদল বহুদিনের প্রচেষ্টায় এই ছবির মূল গড়ন ও বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিল, তাদের কথা ভাবলে বিস্ময় লাগে। কারণ ছবির জগতে যে কথাটা ধ্রুব সত্য, এরা তার সন্ধান পেয়েছিল।'

যামিনী রায় পটচিত্রের সত্যতাকে খুঁজতে চেয়েছেন নির্মাণ-রীতি আর উৎসের ভিতরে। 'বিশ্বপ্রকৃতির নিখুঁত প্রতিলিপি নয়, অথচ প্রকৃতির মূল কথাটুকু দেওয়া নিশ্চয়ই। বিশ্বপ্রকৃতির সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায় তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করাই ছিল এ ছবির উদ্দেশ্য।' পটশিল্পের দৃঢ় ভিত্তির পিছনে পুরনো বিশ্বাসের স্থির নিশ্চয়তাকে যামিনী রায় 'বিশেষ' ভেবেছিলেন। আর ইউরোপীয় শিল্পসংকটের কারণ হিসেবে পুরনো বিশ্বাসের ক্ষয়কেই নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন। খ্রীষ্ট-পুরাণ-বিশ্বাসের প্রভাবেই ইউরোপীয় সংস্কৃতি শিল্প অশ্বাস্তিকে এড়াতে পেরেছে। কিন্তু রেমব্রানটের পর থেকে সমাজভাবনায় পুরাণবিশ্বাস টিকিয়ে না রাখতে পারার কারণে শিল্প সৃজনে শুরু হল অশান্তি। গগাঁ ও ভ্যান গখ গ্রামের সরলতা ও খ্রীষ্টের পুরাণ আঁকবার শেষ চেষ্টা করলেও তা আর সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ সেই বিশ্বাস বা আস্থার জায়গা আর ফিরে আসে নি। এই সংকটের আবর্তে আজকের ইউরোপীয় শিল্পে ভাঙনের রূপ প্রত্যক্ষ। যামিনী রায় ইউরোপীয় শিল্পের সংকটকে এভাবেই দেখতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি গ্রামীণ লোকায়ত শিল্পের বিশ্বাসভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শিল্পসৃজনের ধ্রুব সত্যের অন্বেষায়, অর্জনের আন্তরিক তাগিদেই এই তৃষ্ণা। অবশ্য তিনি জানতেন, পরিবর্তমান সময়ের সঙ্গে সমাজগঠনের পরিবর্তন বিশ্বাসের স্থির নিশ্চয়তাকে অটুট রাখতে পারে

না। ...'এই দেশের চিত্রশিল্পের ধারাও প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল আর ইউরোপীয় শিল্পের ধারাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে নাই আজও পর্যন্ত। আমাকে এই সমাজের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, নানা ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক।' বিষ্ণু দে'কে লিখিত চিঠিতে যামিনী রায় সমাজপ্রেক্ষিতে নিজের সীমাবদ্ধতা এভাবেই চিহ্নিত করতে চান। আর সে কারণেই পুরাণনির্ভর চিত্ররূপগঠনে ভ্যান গথ এবং গগাঁর পূর্ণতাপ্রাপ্তির অভাবের পাশে যামিনী রায়ের চিত্রে লোকরীতি প্রয়োগের সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণসমূহ বুঝতে সাহায্য করে। যামিনী রায় চেয়েছিলেন আধুনিক শিল্প-সাধনার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পৌরাণিক জগতের নিশ্চয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য। এতেই শিল্পের পরিপূর্ণতা, শিল্পের মুক্তি।

ছবিতে গল্প গেঁথে অবনীন্দ্রনাথ তৃপ্ত ছিলেন কি?

চিত্রনির্মাণে, সুরসার কথাবার্তা এসবের সূত্রে রূপকে না বেঁধে, বস্তুরূপের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের মূল্যকে অবনীন্দ্রনাথ কখনই স্বীকার করেন নি। ঘটনা বা আখ্যানের তাৎপর্যে পৃথক-পৃথক বস্তুর পারস্পরিক সংহতি বা ঐক্য গড়ে ওঠায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। "শিল্প ও ভাষা" শীর্ষক রচনায় সে কথাই জানিয়েছেন। পাশাপাশি শিল্পে রহস্যময় ব্যঞ্জনাকেও স্বীকার করে বলেছেন, 'মানুষ মনের মধ্যে ডুব দিয়ে অবিদ্যমানের মধ্যে বিদ্যমানকে ধরলে,—সে হল শিল্পী, সে রচনা করলে, চিহ্নবর্জিত যা ছিল তাকে চিহ্নিত করলে, পাথরের রেখায় রঙ্গের টানে সুরের মীড়ে গলার স্বরে।'

'স্টোরি কনস্ট্রাক্ট করো', অবনীন্দ্রনাথ গল্পকে গাঁথতে চেয়েছেন ছবিতে। এমনকী বেমানান, বেসুরো ছবিকে নাম-পরিবর্তনের জোরেই বৈতরণী পার করে দিয়েছেন। ছবি শুধু রেখারঙের টানে নয়, কাহিনীর আবহ-নির্মাণে তিনি ভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তথাপি যুগধর্মকে অস্বীকার করেন নি। যুগের সঙ্গে ছবির চরিত্র পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য,—'আমি তো চাইনে যে, ছবি একই জায়গায় আটকে থাকুক। আমি একভাবে ছবি এঁকেছি, নন্দলাল আর এক-ভাবে শুরু করল। এরপরে হয়তো আরো কারা আসবে, কৌতূহল জাগাবে, বিস্ময় জাগাবে। কিন্তু মন ভোলাতে ঘুরেফিরে আবার সেই একই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। এছাড়া উপায় নেই।' যুগধর্মকে স্বীকার করেও তিনি পরিবর্তনের মাঝে পিছু ফিরতে চান। এ পিছুটান আসলে ঐতিহ্য আর অর্জিত রুচির সংস্কার।

বিমূর্তবাদ বা পরা-বাস্তববাদ তত্ত্বে শিল্পী আস্থা স্থাপনে রাজি হন নি। কারণ নব্য শিল্প-ভাবনায় রসের স্বাভাবিকতার অভাব তাঁর রসবোধ বা রুচিকে গ্রহণে বাধা দিয়েছে। চোখের ছবিকে শুধু রেখায় ধরতে চান নি। সমুদ্রের গভীরে মনকে ডুবিয়ে, গভীর ভাব সংযোজন করতে চেয়েছেন। কিন্তু শিল্পনির্মাণে ভাবের গভীরতা কী, সে বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত নির্দিষ্ট কোনো বিধি-বিধান বা মানদণ্ড না থাকার কারণে ব্যক্তিরুচির ওপরেই তা নির্ভরশীল। আর সেখানেই গড়ে ওঠে গ্রহণবর্জনের রুচির দ্বন্দ্ব, বিতর্কের নানা বিস্তার।

কাঙ্ক্ষিত রূপ অন্বেষায়—চিত্রী এবং কবির প্রয়াস কি সমধর্মী?

চিত্রী নন, কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে একবার কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন। কবিতার কথা নয়, বরং তাঁরা ছবির জিজ্ঞাসায় উন্মুখ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন বলে আমার বোধ হয় নি।'

একজন কবি বা ভাবুক মানুষ অন্য এক প্রাজ্ঞ কবির ভাষা-ভাবনার নাগাল ছুঁতে এতটাই বাধা পাচ্ছেন কেন? তবে কি ছবির ভাষা-ভাবনার মধ্যেই আছে জটিল রীতি, নির্মিতির বাধা, যা শিক্ষিত

মানুষকেও অনভিজ্ঞতার কারণেই দূরে সরিয়ে দেয়। হয়তো এটাই একটা বড় কারণ, কিন্তু সার্বিক কারণ নয়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কবি বা ভাবুক মন কেন ছুঁতে পারছে না ছবির ভাষা আর ভাবনার দূর ব্যঞ্জনাকে। কিন্তু কবি যে শুধু স্থির আকৃতি-চিত্র অঙ্কন করেন না। স্থায়ী ভাব মাত্র নয়, গম্যমান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা—এসবই মিশে থাকে কবিতার শরীরে। চিত্রের স্থিরতার বদলে সঞ্চরমাণতায় আজকের কবি আর সন্তুষ্ট নন। তিনি চান সঞ্চারের আরো অন্য অর্থ যা 'কবিতার আধুনিক প্রতিমায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানিক রূপের সঙ্গে গূঢ়ভাবে মিশে যায় সময়ের বোধ, দেশ-কালে সম্পৃক্ত হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় এক-একটি ছবি।'

এতৎসত্ত্বেও কবি রবীন্দ্রনাথ ছবির অর্থ বা তাৎপর্য পৌঁছে দিতে পারেন নি অতিথি কবি-ভাবুকদলের মনে, মননে। তবে কি এঁরা ব্যক্তি হিসেবে রসাস্বাদনে অক্ষম ছিলেন, যোগ্যতার অভাবই কি অক্ষমতার একমাত্র কারণ? তেমন বিশ্বাসে মন সায় দেয় না। অতিথি কবি-ভাবুকগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও গ্রহণ সামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস থাকার কারণেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ছবির প্রসঙ্গে কিছু 'বলবার চেষ্টা' করেছিলেন। রেখা ও রঙের নতুন ভুবন থেকে তুলে আনা কিছু অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন কবিমনে, ভাবুকমনে। হয়তো তিনি কবি ও চিত্রীর পারস্পরিক ভাবসূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন সংযোগের সাঁকো, যুক্ততার বিশ্বস্ত সূত্র।

রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে ছবি আঁকা শুরু করেন নি, তখন 'বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগতো কানে, ভাবের রস আসতো মনে।' কিন্তু যে মুহূর্তে ছবি আঁকায় যুক্ত হলেন, 'তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো।' এ দৃষ্টি কবির নয়, চিত্রীর। আর সে কারণেই সমসময়ের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতজন তাঁর ছবিকে যথার্থ স্বীকৃতি না দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সংশয় এবং অবজ্ঞা উপেক্ষা করতে 'আবৃতদৃষ্টির দেশ' এই উপলব্ধিকেই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন।

কবিতার আধুনিকতায় রবীন্দ্রনাথ সৌজন্যের, রসের অসঙ্গতি লক্ষ করেছিলেন।...'সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে।' 'আধুনিক কাব্য' রচনায় রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রতিক কবিতাকে নিজ রুচিসংস্কারের কষ্টিপাথরে বিচার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে সেকালের কাব্যের বাবুগিরি ছিল সৌজন্যের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু একালের কাব্যের বাবুগিরি মূলত পচা মাংসের বিলাসে যুক্ত। কাব্যে অঘোরপন্থী সাধনার কারণে শুচিশুভ্র রুচির সংহার বিষয়ে তিনি কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত ছিলেন। অথচ ছবিতে আক্রমণকারীর নির্মম যথেচ্ছাচার নিয়ে ভারতীয় চিত্রকলার আত্মতৃপ্ত নিশ্চলতার রাজ্যে কালাপাহাড়ি প্রবৃত্তিতে আসক্তি প্রকাশ করেছেন। গ্রহণযোগ্য সুন্দরকে কালি ঢেলে কাঙ্ক্ষিত রূপ নির্মাণের অন্বেষায় ব্রতী হয়েছেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে পূর্বার্জিত খ্যাতির অসারতা বুঝতে পেরে, সব মোহ ত্যাগ করে এগিয়েছিলেন নতুন সৃজনের সন্ধানে। পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্বের অ্যাবস্ট্রাক্ট রীতি বা বিমূর্ত ধারণাকে ব্যঙ্গ করলেও, তাঁর কাছে ছবি 'সাইলেনট মিউজিক' ভিন্ন আর কিছুই নয়। শিল্পী পিকাসো চেয়েছিলেন নীরবতার মধ্য দিয়ে বাস্তবে পৌঁছতে। আর বিমূর্ত-বাদী শিল্পীদলের অন্যতম ক্যানডেনস্কি "ইনার স্পিরিচ্যুয়াল ভ্যালু"কেই ছবির প্রাণ গণ্য করেছেন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘলালিত রুচি অভিজ্ঞতায় অর্জিত সাফল্যকে ব্যর্থ মনে করে, খেলার ছলে শব্দ আর ছবির কোলাজে, কিংবা বর্জিত বস্তুর মধ্যেও নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। শব্দ বা বস্তুর সাধারণ অর্থ পেরিয়ে ছুঁতে চেয়েছেন নৈশব্দ্যের দূরযানী রূপ। আবেগপ্রবণ স্বপ্নচারী দৃষ্টির পক্ষেই যা আয়ত্তে আনা সম্ভব। সীমাহীন নয়, সীমায়িত পটে রেখারঙের আপাত অর্থহীন খেলার ছলে, শিল্পিত উত্তরণের মধ্যেই যার মুক্তি।

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

মানবমনে হিংসাভাব প্রশমনে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রভাব

মহম্মদ ফজলে কাদের

ধ্বংসের হাতিয়ার নির্মাণে পৃথিবীর সম্পদশালী দেশগুলি কীভাবে মেতে উঠেছে, তা আমরা জানি। আর তাতে মানবজাতির যে অশেষ ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, এও আমরা জানি। কিন্তু এর প্রতিকার কী? এটা আমরা সঠিক জানি না। মানুষের মন থেকে হিংসাভাব দূর করার জন্য আমরা এতদিন মূলত ধর্মের উপর নির্ভর করেছি। কার্যত দেখা যাচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি। এর জন্য একটা নতুন দিকের উপর আমরা এখনও প্রয়োজনীয় গুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টি দিতে পারি নি। সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষের মনকে অহিংসার পথে নিয়ে যাওয়া। এটাই এই লেখার বিষয়।

মানুষের জন্ম হয়েছিল কবে, অর্থাৎ মানুষ কখন দু-হাত ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে চলতে শিখেছিল? এর সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। মানুষের জন্ম কবে হয়েছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ওঁদের মতে, ১০ লক্ষ হতে ২০ লক্ষ বছর আগে সোজা-হয়ে-দাঁড়ানো মানুষের জন্ম। অতি সম্প্রতি ইজরায়েল অঞ্চলে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, আধুনিক মানুষের (মর্ডান ম্যান) উদ্ভব প্রায় এক লক্ষ বছর আগে। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসের শুরু আনুমানিক আট হাজার বছর আগে। ওই সময় ইজিপ্টে কাদার ব্লকে মানুষ প্রথম অক্ষরসৃষ্টির চেষ্টা করে—এটাই ঐতিহাসিকদের ধারণা। তার পূর্বে প্রায় দশ লক্ষ বছর মানুষ কীভাবে কাটাল? এ সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অন্ধকারে আছি, বিশেষ কিছু জ্ঞান আমাদের নেই; কিছু-কিছু কল্পনা করতে পারি। তখন পৃথিবীতে উদ্ভিদের প্রসার অর্থাৎ জঙ্গলের পরিমাণ ছিল অনেক-অনেক বেশি। সুদূরপ্রসারী গভীর অরণ্যানীতে রাজত্ব ছিল বন্য প্রাণীদের। মানুষের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। সর্বক্ষণই মানুষকে বন্য জন্তুদের ভয়ে কাটাতে হত। তারপর এই নতুন মানুষদের প্রকৃতির নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে অনবরত লড়াই করতে হত। অহোরাত্র বন্য প্রাণী আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে-করতে তাদের মনের গঠন হয়ে উঠেছিল হিংসাত্মক আর স্বার্থপর। শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যানীতে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়েছে মানুষকে। বিপদের সম্ভাবনা জানামাত্রই তাদের সমস্ত স্নায়ু কাজে লেগে যেত কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়; সর্বদা সজাগ থাকতে হবে চরম প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে। এর ফলে মানুষ হয়ে উঠল আত্মকেন্দ্রিক, আক্রমণাত্মক, নিজেকে বাঁচাবার জন্য হিংস্র আর স্বার্থপর। তারপর তাদের সংখ্যা যখন বাড়ল, তারা এক-এক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হল। হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে একা লড়াই করতে না পারায় তারা গোষ্ঠী গঠন করল। নানা বিষয় নিয়ে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর লাগত বিরোধ। এভাবে তাদের মন ক্রমশ শানিত হতে লাগল হিংসার পথে। যদি বাঁচতে চাও, লড়াই করো, নিজের বাঁচার জন্য অপরকে খতম করো, সে জন্তুই হোক বা মানুষই

হোক। কোনো দয়া নেই, মায়া নেই।

আমরা অনুমান করতে পারি—মানুষের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল, যত তারা আরো প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, তাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর হানাহানি বাড়তে লাগল। কোনো শক্তিশালী পুরুষকে দলপতি করে এক-একটা দল গড়ে তোলা হল আর বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ দেখা দিল। ছুঁড়ে মারার মতো প্রচুর পাথর সংগ্রহ করে, গাছের ডাল থেকে লাঠি বানিয়ে, পাথরকে ঘষে-ঘষে অস্ত্র বানিয়ে, বন্য জন্তুর হাড়কে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে তারা অস্ত্র তৈরির পথে উন্নতি করতে শুরু করল। নারী আর খাবারের ভাগ নিয়ে উঠত বয়সী শক্তিশালী তরুণ প্রবীণ দলপতিকে চ্যালেনজ করতে শুরু করল এবং মাঝে-মাঝেই খুন-খারাবি হতে লাগল।

বহু শতাব্দী ধরে যখন এইভাবে রক্তপাত বেড়ে চলল, তখন কিছু জ্ঞানী মানুষের মনে হল এর কোনো প্রতিকার করা দরকার। একেই আমরা বলতে পারি মানুষের মনে প্রথম ধর্মভাবের উদয়। বাইবেলে বর্ণিত আছে—আদিমানব আদমের এক পুত্র কেইন তার ভাই আবেলকে হত্যা করে। বাইবেলের মতে, এই প্রথম মানবহত্যা, এই হত্যার রক্ত থেকেই জন্মেছিল হিংসার প্রসার। সেজন্য বাইবেলের একটা প্রধান উপদেশ: 'Thou shalt not kill'। অবশেষে যিশুখ্রীষ্ট অহিংসার জন্য প্রাণ দিলেন। পার্শি সম্প্রদায় বলেন যে তাঁদের ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা জরথুষ্ট্র জন্মেছিলেন ৩৭০০ বৎসর পূর্বে, এবং ইতিহাসে তিনিই প্রথম ধর্মপ্রচারক। তবে মনে করা যেতে পারে—হিংসার বিরুদ্ধে প্রথম সবথেকে জোরালো আন্দোলন হয়েছিল ভারতের মাটিতে এবং তার প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। প্রায় ২৫০০ বৎসর আগে বুদ্ধের জন্ম। তাঁর বাণী 'অহিংসা পরমধর্ম' দেশে-দেশে উদবুদ্ধ করেছিল লক্ষ-লক্ষ মানুষকে।

ধর্মের মধ্যে সবথেকে শেষে এসেছিল ইসলাম। এর প্রবর্তক হজরত মহম্মদ। কিন্তু ইসলামধর্মের মতে, প্রথম সৃষ্ট মানব আদম থেকেই ইসলামের শুরু এবং কথিত আছে—এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ আদমের সময় থেকে হরজত মহম্মদের সময় পর্যন্ত জন্মেছিলেন মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য। এ বিষয়ে বাইবেলের সঙ্গে কোরানের যথেষ্ট মিল দেখা যায়। বাইবেলে বর্ণিত ধর্মপ্রচারকদের নাম কোরানেও পাওয়া যায়। এঁরা সৃষ্টির আদিযুগ থেকে মানুষকে ধর্ম আর কল্যাণের পথ দেখানোর জন্য যুগে-যুগে, দেশে-দেশে জন্মেছিলেন বলে বলা হয়েছে। বড়ো-বড়ো ধর্মের ধর্মপ্রবর্তকরা ছিলেন সকলেই মহাজ্ঞানী তাপস। ধ্যানের মধ্য দিয়ে, সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁরা তত্ত্ব লাভ করেছিলেন। সেজন্য সব ধর্মের মূল শিক্ষা মানবকল্যাণ। বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম মানুষের যে উপকার করেছে, তার মূল্যায়ন হয়তো আমরা ঠিক-মতো করতে পারি না। মনে আছে, বাবার কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম (বিশের দশকে বাবা নোয়াখালি জেলার মফসসলে সরকারি চাকুরে): ওখানে বাজারে বড়ো-বড়ো হাঁড়িতে দুধ বিক্রি হত। বাবা শহর থেকে গেছেন, স্বভাবতই দুধ খাঁটি কিনা সন্দেহ। একজন দুধ-বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন, দুধে জল মিশিয়েছে কিনা। উত্তর পেলেন, বলেন কী বাবু! দুধে জল মিশালে যে অধর্ম হবে এবং তার ফলে ছেলে মারা যাবে। ধর্ম বরাবরই মানুষকে দিয়েছে পাপের ভয় আর পুণ্যের লোভ। কাজে-কাজেই ধর্মের দ্বারা যে মানুষের কতখানি কল্যাণ হয়েছে—আমরা তা ঠিক বুঝতে পারি না।

মধ্যযুগে ধর্মের নামে বহু স্থানেই—বিশেষত য়ুরোপে—বহু হানাহানি হয়েছে, বহু রক্তক্ষয় হয়েছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে রোমান-ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যানটদের মধ্যে হানাহানিতে যে কী রূপ লোকক্ষয় হয়েছে, তার অনেক বিবরণ ইতিহাসে আমরা পাই।

এ ছাড়া ইসলামধর্মাবলম্বী আর খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেক সংঘর্ষ বহু কাল চলেছে। উদীয়মান হিন্দু-

রাজশক্তির প্রভাবে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়েছে। ইদানীং ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে যে বিপুল রক্তক্ষয় আর নারীজাতির উপর যে অত্যাচার হয়েছে, তা আমাদের সকলকে ম্রিয়মাণ করে।

রেনেশাঁস-পরবর্তী যুগে ইউরোপে একদল গুণী-জ্ঞানীর উদ্ভব হল, তাঁরা ধর্মের থেকে নীতি আর বিবেকের উপর বেশি জোর দিলেন। বিবেকবান আর সুনীতিপরায়ণ মানুষ সবার উপরে—এই আদর্শই তাঁরা প্রচার করলেন। ধর্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির থেকে বিবেক, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, মানুষের উপকার করা—এইসকল গুণের উপর তাঁরা জোর দিলেন। অবশ্য এই ধরনের লোক চিরকালই দেখা যেত। তবে এই সময়ে—অর্থাৎ অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে—শিক্ষিত সমাজের উপর এঁদের বিপুল প্রভাব দেখা যায়। বহুজনই এই সময় এই সমস্ত শিক্ষা দিয়েছেন। এঁদের নীতি এবং মূল্য-বোধের শিক্ষক বলা যেতে পারে।

এখন লক্ষ করা যাক: বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা কী? যদি কেবলমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে শুরু করি, পাঁচ কোটি লোক মারা গিয়েছিল এই মহাযুদ্ধে। তারপর কোরীয় মহাযুদ্ধ, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আলজিরিয়া, ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, আরো বহুস্থানে হানাহানিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরেও এক কোটি ৮০ লক্ষ লোক ক্ষয় হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের ইরান-ইরাক যুদ্ধের এবং আফগানিস্তানের দুঃখজনক রক্ত-ক্ষয় এর মধ্যে ধরা হয় নি। তারপর ঘটেছে ইরাক এবং বহুজাতিক বাহিনীর সংঘর্ষ। একমাত্র হিরোশিমা নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে মানুষ যে পশুত্ব দেখিয়েছে, তা তুলনাহীন। পশুত্ব বললেও ব্যাপারটার ঠিক আন্দাজ হয় না। কারণ হিংস্র পশুরা তাদের খাদ্যের জন্য হত্যা করে, কিন্তু তুলনায় মানুষের হিংস্রতার কোনো শেষ নেই। যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই প্রতিদিন কত মানুষ মানুষেরই হাতে প্রাণ দেয়। আমরা একবার চিন্তা করলে আমাদের হিংস্রতার পরিমাণ বুঝতে পারি। আমেরিকার মতো উন্নত এবং ধনী দেশে খুনের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তা ভাবলে আমাদের বর্তমান সভ্যতার গর্ব কি আমরা করতে পারি? এই তো গেল মানুষের মধ্যে হানাহানির বিবরণ।

আর-একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ করা যাক। মানুষের মারণাস্ত্র তৈরির বিবরণ। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের এক পরিসংখ্যান দ্বারা জানা যায় যে, শুধু ১৯৮৫ সালে সারা বিশ্বের সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল এক ট্রিলিয়ন ডলার। বর্তমানে এই ব্যয়ের পরিমাণ নিশ্চয় আরো বেড়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, এই অবিশ্বাস্য অঙ্কের কেবল লক্ষ ভাগের এক ভাগ দ্বারাই বিশ্বব্যাপী শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যপরিকল্পনা-গুলি বাস্তবায়িত করা যেত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—ধর্ম তার কাজ করেছে। যাঁরা কেবলমাত্র নীতি এবং মূল্যবোধ শিক্ষার গুরু, তাঁরাও তাঁদের কাজ করেছেন, কিন্তু মানুষের মন থেকে হিংসাভাব কমে নি। সভ্যতা মানুষকে দিয়েছে নানারূপ জাগতিক সম্ভার, কিন্তু তার আদিম হিংসা-প্রবৃত্তি দূর করতে পারে নি।

এখন আমাদের হিংসাভাব দূর করতে নতুন দিক খুঁজতে হবে। বিজ্ঞানের প্রতি তাকালে আমরা এই নতুন দিকের সন্ধান পেতে পারি। বিজ্ঞানের উন্নতির গতিপথ লক্ষ করলে দেখা যাবে—বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যেরূপ অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, সে অনুপাতে মনোবিজ্ঞানের উন্নতি হয় নি। এই মনোবিজ্ঞান এবং তৎসহ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শারীর-বিজ্ঞান-সমূহ—এসবের ঠিকমতো উন্নতি সাধন করে আমরা মানুষের মন থেকে হিংসাভাব বহুলাংশে দূর করতে পারি, এবং আমার ধারণা এটাই হবে প্রকৃষ্ট উপায়।

জৈব-রসায়ন মানুষের মনের উপর কেমন প্রভাব ফেলতে পারে, এখানে একটু বলে নেওয়া যাক। একজন পুরুষ খুনীর রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে, যেখানে সাধারণ পুরুষের কোষে এক্স্-ওয়াই দুটি ক্রোমোসোম (X-Y chromosome) থাকে, সেখানে ওই খুনীর কোষে ৩টি—যথা এক্স্ + ওয়াই + ওয়াই ক্রোমোসোম ছিল। সম্প্রতি শিকাগোর আরগোন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে দুজন জীববিজ্ঞানী সাত বৎসর গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিদের চুলে ধাতব পদার্থ—যেমন দস্তা, তামা, কোবল্ট ইত্যাদি সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। নিশ্চয় গবেষণার ক্ষেত্রে এবং গভীরতা বাড়িয়ে এইরকম আরো নতুন-নতুন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অল্প বয়সে চুল পরীক্ষা করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা অপরাধপ্রবণ তাদের শনাক্ত করা যেতে পারে।

বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ শক্তিশালী দেশগুলিতে এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশেও যে বিশাল পরিমাণ অর্থ, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মেধা ও শ্রম এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যয়িত হচ্ছে মারণাস্ত্রের উন্নতি আর পরিমাণ বৃদ্ধির খাতে, এই ব্যয়ের বহুলাংশ কমিয়ে সেই অংশ যদি কাজে লাগানো যায় মনো-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে, আমার স্থির বিশ্বাস তাতে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ হবে। মনোবিজ্ঞান এবং এর সঙ্গে জড়িত জীববিজ্ঞান আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সকল উন্নত দেশে এক বিশাল কর্ম-যজ্ঞের সূচনা করা হোক; এতে নিয়োজিত করতে হবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের। অন্যান্য ভৌতিক বিজ্ঞানের উপর মর্যাদা দিতে হবে মনোবিজ্ঞানকে কারণ মনই মানুষকে চালায়। মনোবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য ইউনাইটেড নেশনস্-এর অধীনে একটা বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে যাতে সকল উন্নত এবং উন্নতিকামী দেশ সম্মিলিতভাবে যোগ দিতে পারে এই বিরাট গবেষণাযজ্ঞে। এর ফলে হয়তো শীঘ্র মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং মানসিক গঠনের উপর জৈব রসায়নের প্রভাবের ক্ষেত্রে এমন ফল পাওয়া যেতে পারে যাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। গবেষণালব্ধ ফল হতে কিছু সার্বজনীন প্রযোজ্য নির্দেশনামা বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত করতে পারবেন যেটি অনুসরণ করলে হিংসাভাব বহুলাংশে কমিয়ে দেওয়া যাবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা নির্দেশিত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যসূচী, বিশেষ ট্রেনিং, খেলাধুলা, বিশেষজ্ঞ নির্দেশিত শিক্ষা এবং বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ওষুধের প্রয়োগ দ্বারা মানুষের মন থেকে হিংসাভাব কমিয়ে দেবার একটা সক্রিয় চেষ্টা নেওয়া যেতে পারে। এ কাজে সফল হতে নিশ্চয় কিছু সময় নেবে। যেমন বিজ্ঞানের যে-কোনো নতুন দিক উন্মোচন করে মানুষের জন্য কাজে লাগাতে সময় লাগে। হয়তো প্রথম দিকে সহজে ফল পাওয়া যাবে না, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা চালিয়ে গেলে ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকছেই।

মহম্মদ ফজলে কাদের একজন রসায়নবিদ। জন্ম ১৯২০ সালের ১লা মার্চ, হাওড়া জেলায়। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর রসায়নবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কর্মজীবনে ধানবাদে সেনট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এবং যাদবপুরে গ্লাস অ্যানড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞান হিসাবে কাজী করার পর বেলুড়ের ন্যাশন্যাল আয়রন অ্যানড স্টীল এবং ক্যালকাটা স্টীল কর্পোরেশন লিমিটেডে প্রধান রসায়নবিদের দায়িত্ব পালন করে অবসর নিয়েছেন।

মতামত

১

"কলকাতার মানস" এবং অবাঙালি দৃষ্টিকোণ

"চতুরঙ্গ" জুলাই ১৯৯১ সংখ্যায় শ্রীঅশোক মিত্রের লেখা "কলকাতার মানস" সাগ্রহে পড়লাম। একজন কলকাতাবাসী তামিলভাষী হিসেবে এ প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙলার বর্তমান অবক্ষয় নিয়ে লেখকের অনুতাপ সহজবোধ্য। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁর সমালোচনা যেন একটু বেশি নিষ্ঠুর হয়েছে। কারণ, যে অবক্ষয়ের কথা তিনি বলেছেন সেটা ইদানীং কমবেশি সব অঞ্চলেই দেখা যায়।

অন্য ভারতীয় ভাষার প্রতি বাঙালির উদাসীনতার কথা বলেছেন লেখক। কিন্তু সারা দেশেই তো একই অবস্থা। প্রত্যেকটি প্রদেশেই ইংরাজি মিডিয়াম নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অহিন্দিভাষীরা যদি হিন্দি শেখে, সেটা হিন্দি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বা হিন্দিভাষীদের সঙ্গে যোগাযোগের আগ্রহের জন্য নয়, সেটা শুধু প্রাগম্যাটিক বা অর্থনৈতিক কারণেই। দেশের সর্বত্র জার্মান বা ফরাসি ভাষা শেখার জন্য যে আগ্রহ দেখা যায় তা অন্য ভারতীয় ভাষা শেখার বেলায় একেবারে নেই।

লেখক একজন কন্নড়ভাষীর বাঙলাসাহিত্যানুরাগের কথা বলেছেন। এর থেকে ধরে নিয়েছেন যে অ-বাঙালিরা সচরাচর অন্য ভাষা-সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী। এটা ঠিক ধারণা নয়। এই শতকের ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে বহু ভারতীয় ভাষায় পর্যাপ্ত মৌলিক গল্প-সাহিত্যের অভাবে বাঙলা, হিন্দি, মারাঠিভাষা থেকে কিছু উৎকৃষ্ট রচনা সেই ভাষাগুলিতে অনূদিত হয়। সুতরাং সেই ভাষাভাষীরা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, ভি. এস. খাণ্ডেকার প্রমুখ লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে অবস্থাটা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এই সময়ে বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর মৌলিক রচনা রচিত হওয়ায় অনুবাদের আর তেমন চাহিদা রইল না। আমি তামিলদের কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের তামিল প্রজন্ম তারাশঙ্করের পরবর্তী বাঙলা লেখকদের সম্পর্কে প্রায় অনভিজ্ঞ। এই প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের নাম শুনেছে, কিন্তু তাঁদের রচনা পড়তে পায় না। কারণ পুরোনো অনুবাদগুলোর পুনরমুদ্রণ হয় না।

হাজার-হাজার তামিল কলকাতায় এবং পশ্চিম-বাঙলায় বসবাস করেন। তাঁদের ছেলেরা বাড়িতে তামিল বলে, স্কুল-কলেজে ইংরাজি হিন্দি পড়ে, দৈনন্দিন ব্যবহারে অনায়াসে বাঙলায় কথাবার্তা বলে, কিন্তু তামিল বা হিন্দি বা বাঙলা সাহিত্যে তাদের কোনো আগ্রহ দেখা যায় না।

কিছু ঐতিহাসিক কারণে দেশে সর্বপ্রথম রেনেসাঁস আত্মপ্রকাশ করেছিল বাঙলায়। এর ফলে আধুনিক শিল্প-সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বাঙলা অগ্রণী হয়েছিল। কালক্রমে অন্যান্য প্রদেশেও এই চর্চা উৎকর্ষ লাভ করায় বাঙলার অগ্রণী ভূমিকা আর নেই। এটা স্বাভাবিক ক্রমবিবর্তনের ব্যাপার। এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই।

কিন্তু আনন্দের কথা—এখনো বাঙলায় কিছু আশাব্যঞ্জক লক্ষণ রয়েছে। যেমন বাঙালির বইপ্রীতি, শিভালরি, গরিব-দুঃখীদের প্রতি সমবেদনা, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনে উৎসাহ, পাড়ায়-পাড়ায় নিয়মিত সাহিত্য-আসর ইত্যাদি। নেতিবাচক দিক-গুলিও আছে, যেমন পুজো নিয়ে বাড়াবাড়ি, চাঁদার জুলুম, বিনোদনের নামে হৈ-চৈ, হট্টগোল ইত্যাদি। কিন্তু এটাও বোধ হয় যুগধর্মের অভিব্যক্তি মাত্র।

সুব্রমনিয়ন্ কৃষ্ণমূর্তি
২২/২৪ মনোহরপুকুর রোড
কলকাতা-২৯

২

মানিকচাঁদের গীত

"চতুরঙ্গ" জুন ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত "বাঙলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে চণ্ডীমণ্ডপ" (লেখক : অরবিন্দ সামন্ত) প্রবন্ধটির উৎসুক পাঠক হিসেবে আমার বর্তমান বিনীত নিবেদন।

লেখক লিখেছেন, "মানিকচাঁদের গীতে—'শীতল মন্দিরঘর' কিংবা 'বাঙ্গলা ঘরের' কথা আছে।" এ ব্যাপারে প্রদত্ত সূত্রনির্দেশিকায় লেখক জানাচ্ছেন, "মানিকচাঁদের গীতে উদ্ধৃনী রাণার মুখে বলানো হয়েছে, 'কার লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দিরঘর / বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালী,' মা. গী. পৃ ৯৩।"

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে "মানিকচাঁদের গীত" নামক কোনো প্রকাশিত পুস্তকের (যার ৯৩নং পৃষ্ঠা থেকে লেখক উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেছেন) খবর এই প্রথম শোনা যাচ্ছে।

বরং, যে সংবাদের সঙ্গে বহুপূর্ব হতেই বাঙলা সাহিত্যের সচেতন পাঠকমাত্রই পরিচিত তা হচ্ছে এই যে প্রখ্যাত ইংরেজ বুদ্ধিজীবী জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন রংপুরের লোকভাষা-নিদর্শনের সংগ্রহের সময় সেখানকার নাথযোগীদের মধ্যে একটি গীতিকার সন্ধান পান। গায়কদের কণ্ঠ থেকে নিয়ে যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে সেই গীতিকাটি গ্রীয়ার্সন ভাষায় লিপি-বদ্ধ করেন এবং বহুবিধ পাদটীকার সঙ্গে সেটিকে "The song of Manikchandra" শিরোনামে Journal of Asiatic Society of Bengal-এ ১৮৭৮ সালে (Part one, No. 3) প্রকাশ করেন। ভূমিকায় গ্রীয়ার্সন মন্তব্য করেছেন, 'In my notes on the Rangpur dialect, I promised to give an account of the song whose name heads this article, and that promise I shall now do my best to redeem. I find, however, that the task has been more difficult than I antlcipated.'

গ্রীয়ার্সনের এই সংগ্রহ বাঙলার প্রথম লোক-সাহিত্যসংগ্রহ। এ ব্যাপারে গ্রীয়ার্সন রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী (সেটিই কি আসল কারণ যে লোকসংস্কৃতি-চর্চার অন্যতম পুরুষ হিসেবে বর্ণিত রবীন্দ্রনাথ সারা-জীবনে কখনো মানিকচাঁদের গান সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেন নি?)।

গ্রীয়ার্সনের এই সংগ্রহটিকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার স্তরে তোলেন দীনেশচন্দ্র সেন। "মানিকচাঁদের গান"-কে তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির অন্যতম বলে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙলার ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নিরিখেও এর স্থান দীনেশচন্দ্র-কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গবেষক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, 'বাঙলায় জাতীয় ইতিহাস একটি বাঞ্ছিত পদার্থ। ইতিহাসের উপকরণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তূপরূপে প্রাচীন মন্দির-মসজিদরূপে বা দীঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তিরূপে কিংবা লোকমুখে ছড়া ও কিংবদন্তীরূপে ছড়ানো রহিয়াছে। মানিকচাঁদ রাজার গান লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।' (দ্রষ্টব্য : উচ্চ-মাধ্যমিক বাঙলা

সংকলন, জুলাই ১৯৮৭, পৃ ৭৪)। বাঙলার ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ হিসেবে শহীদুল্লাহ্, "মানিকচাঁদের গান"-কে দেখতে পেলেও তা দেখতে পান নি ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, তাঁর সম্পাদিত "History of Bengal" থেকে মানিকচাঁদের গান নির্বাসিত! রমেশচন্দ্র দ্বিজাতিতত্ত্বের একজন প্রকাশ্য সমর্থক।

দীনেশচন্দ্র-শহীদুল্লাহ্ ছাড়া রবীন্দ্রনাথসহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের প্রায় সকলেই "মানিকচাঁদের গান"-কে এড়িয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত ও সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বাংলা সাহিত্য" নিবন্ধটির (বিশ্বকোষ, সপ্তদশ খণ্ড, সাক্ষরতা, মার্চ ১৯৮৬, পৃ ১৪৯-১৫৩) উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানেও মানিকচাঁদ সম্পর্কে পুরোপুরি উপেক্ষা।

ব্রাহ্মণ্যবাদী চালাকির অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বিকল্পবাদের আলোচনা করেছেন শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ। (দ্রষ্টব্য : বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬, পৃ ৪০)। অর্থাৎ লোকসাহিত্যের 'লোক'-কে হটিয়ে সেটিকে হয় একেবারে নিশ্চিহ্ন আর না হয় ব্রাহ্মণ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যে রূপান্তরিত করার কৌশল হিসেবে একটি বিকল্প সাহিত্য চালু করা; তাতে বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন লোকসাহিত্যের আসল নিদর্শনটি যে ক্রমশই চোখের আড়ালে থেকে যাবে, তা তো একেবারেই স্পষ্ট। গোয়েবল্‌সীয় কায়দায়, তখন, বিকল্পটিকেই আসল বলে চালিয়ে দিলেই হল। গ্রীয়ার্সনের মানিকচাঁদকে আড়াল করার গোপন—মানস থেকে এরও কোনো বিকল্প বাজারে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ছেড়েছেন কি?

গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহটি প্রাগুক্ত পত্রিকায় শুরুই হয়েছে ১৩৫ পৃষ্ঠা থেকে। আর লেখক অরবিন্দবাবু যখন তাঁর দেখা "মানিকচাঁদেয় গীত"-এর ৯৩ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তখন এটি স্পষ্ট যে, এটি ও গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহটি সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা একান্তভাবেই শ্রদ্ধেয় অরবিন্দবাবুর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকব তাঁর দেখা "মানিকচাঁদের গীত" নামক পুস্তকটির পূর্ণ পরিচয় জানার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অরবিন্দবাবু লিখিত "উদুনী রানা" নামক কোনো চরিত্রই গ্রীয়ার্সনেয় সংগ্রহে নেই, আছে "অদুনা" নামক এক রাজকন্যার।

মনে রাখতে হবে, দ্বিজাতিতত্ত্ব শুধু প্রকাশ্যেই সমর্থিত, তা নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গির গোপন লালন-পালন-ও সম্ভব। "মানিকচাঁদের গান" নাথসংস্কৃতি-সঞ্জাত, যা দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। পুপুল জয়াকরের ভাষায়, 'In the Baul songs and in the tales of the Natha Yogis, the distinction between Hindus and Muslims grows dim.' (The Earth Mother, Penguin, 1990, p 81).

দেবাশিস নাথ
আসানসোল-৭১৩০০৩

৩

"নসিবিবির ঝুড়ি"

"চতুরঙ্গ" জুলাই ১৯৯১ সংখ্যায় "নসিবিবির ঝুড়ি" গল্পটি প্রকাশ করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। গল্পটিতে অন্তর- ও বিবেকস্পর্শী প্রতিবাদী চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য লেখককেও ধন্যবাদ।

আমাদের ঘরের আনাচে-কানাচে পথেঘাটে মাঠে-হাটে যেসব অন্যায়-অবিচার প্রত্যহ ঘটে যাচ্ছে —আমরা দেখেও না দেখার ভান করি, আপোস করি, ঝামেলায় জড়াতে চাই না, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর বলে। নসিবিবি তার ব্যতিক্রম বলেই ভালো লাগে। অন্যায়ের প্রতিবাদে জীবনের ঝুঁকি নিতে সে পিছোয় নি। নরপশুহত্যায় তার হাত কাঁপে নি। নসিবিবি আমাদের নিঃশেষিতপ্রায় বিবেকবোধ এবং লুপ্তপ্রায় পৌরুষকে উজ্জীবিত করে। নসিবিবি নারীর অধিকার রক্ষায় একজন নেত্রীও।

মান্নাফ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে পরিচিত পরিবেশ থেকে চরিত্রটিকে পেয়েছেন—তাই চরিত্রের নাম নসিবিবি। চরিত্রের নাম হরিমতী হলেও আমাদের কাছে গল্পের মূল বিষয়টি সমান গ্রহণীয় হত।

প্রতিজ্ঞার প্রতীক ঝুড়িটি অনেক সময় ধরে মনে থাকবে। চমৎকার প্রতীক।

যামিনীকান্ত সিংহ
লীলানিকেতন, রবীন্দ্রপল্লী
বীরভূম

* * *

গল্পটি আমাকে ভীষণভাবে টেনেছে। আমার গ্রামে নসিবিবির মতো এক বিধবা, গরিব মহিলাকে দেখেছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় রুখে দাঁড়াতে। মেয়েটি মারা গেছে। তাকে আমরা সবাই কিরণবুড়ি বলতাম। নসিবিবি যেন তারই ছায়া। তাই নসিবিবিকে আমার আপনজন মনে হচ্ছে। "নসিবিবির ঝুড়ি"র মতো এত ভালো গল্প বহুদিন পড়ি নি। মুসলিম সম্পর্কে আমার ভাবনাটা বদলে গেল।

বনানী চ্যাটার্জী
খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ

* * *

"নসিবিবির ঝুড়ি" পড়ে বুঝলাম গল্পের মাধ্যমে মুসলিম সমাজচিত্র কত সুন্দরভাবে অঙ্কন করা যায়। গল্প পড়ার পরেও গল্পের রেশ থেকে গেছে। শুধু মুসলমান সমাজেই নয়, সব সমাজেই নসিবিবির মতো নারীর দরকার।

অপূর্ব মিত্র
লালবাজার, বাঁকুড়া

৪

অভিনন্দন

"চতুরঙ্গ" অগস্ট ১৯৯১ সংখ্যা এইমাত্র পেয়েই পড়তে পারলুম। অসাধারণ একটি সংখ্যা আপনারা প্রকাশ করেছেন। দেবকুমার বসু, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা হালদার এবং অচিন্ত্য বিশ্বাস যে উচ্চমানের আলোচনা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে, ইতিপূর্বে কোনো বাঙলা পত্রিকার একই সংখ্যাতে এ ধরনের উচ্চমান প্রবন্ধ-সংকলন দেখি নি। আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ড. দেবকুমার বসু যে প্রাঞ্জল ভাষায় অর্থনীতির বিশেষ দুরূহ তত্ত্ব আলোচনা করেছেন, বাঙলাতে তা পড়ে আমার মনে হচ্ছে যে ড. বসু যাতে অর্থনীতির তত্ত্ব সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় আরো লিখতে পারেন, সেজন্য তাঁকে উদ্‌বুদ্ধ করা আমাদের সকলের বিশেষ আশু কর্তব্য। দেবকুমারবাবুর মতো স্বচ্ছ নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথনির্দেশ নিয়ে আলোচনা যত বেশি হয় বাঙালির ততই বেশি মঙ্গল হবে। প্রত্যক্ষ পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আলোচনা করলে যে উচিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তা কালেস্‌কির রচনার উল্লেখ করে ড বসু খুব ভালো করেই দেখিয়েছেন।

আপনার সম্পাদনায় "চতুরঙ্গ" বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্র হতে চলেছে। সেজন্য অভিনন্দন।

সুভাষচন্দ্র সরকার
সি ২৮/২৪৪ গান্ধী নগর, রোড নং ৩
বান্দ্রা ঈস্ট, বোম্বাই ৪০০ ০৫১

*[সুভাষচন্দ্র সরকার "কমার্স" পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক।]